৭.১৯ হীমাগারে দস্যু বনহুর – Bangla Library

৭.১৯ হীমাগারে দস্যু বনহুর – Bangla Library

হীমাগারে দস্যু বনহুর–১১৯

মনিরা, নূর ও আরমান গাড়ির শব্দে ফিরে তাকালো। আশ্চর্য হলো তারা। মনিরার গাড়িখানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে একটা পুলিশ ভ্যান।

মনিরার চোখ দুটো ধক করে জ্বলে উঠলো।

নূর নিচের ঠোঁটখানা উপরের দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলো।

আরমান দুচোখে বিস্ময় নিয়ে তাকালো নূরের মুখের দিকে।

ততক্ষণে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী মনিরার গাড়ির ড্রাইভারকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সকলেই অস্ত্র বাগিয়ে ধরেছে তার দিকে।

আরমান বলে উঠলো–নূর, একি করছেন ওরা?

নূর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে।

মনিরা কিছু বলতে যাচ্ছিলো, নূর হাত দিয়ে তার মুখে চাপা দেয়।

নেমে আসে নূর নিচে।

পুলিশবাহিনীর সঙ্গে রয়েছেন মিঃ হ্যানরী বার্ড। তিনি কিছু দিন হলো পুলিশপ্রধান হয়ে কান্দাই এসেছেন। বয়স চল্লিশের ওপর, চোখেমুখে হিংস্র ভাব। গোয়েন্দা বিভাগে তিনি অনেকদিন কাজ করেছেন। এ কারণেই তাকে কান্দাই সরকার পুলিশ প্রধান হিসেবে এখানে নিয়োগ করেছেন।

নূরের সঙ্গে পরিচয় তেমন ঘটেনি তবে সামান্য কিছু আলাপ হয়েছিলো তার সঙ্গে কান্দাই পুলিশ অফিসে। আজ হঠাৎ তার বাংলোয় এভাবে মিঃ হ্যানরী বার্ডকে দেখে অবাক না হলেও কিছুটা বিস্মিত হলো।

মিঃ হ্যানরী বার্ডের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললো নূর–কি ব্যাপার মিঃ হ্যানরী?

মিঃ হ্যানরী গম্ভীর কণ্ঠে বললো–দুঃখিত যে আপনাকে না জানিয়ে আপনার বাংলোয় আমাকে প্রবেশ করতে হলো। কথাগুলো বলেই মিঃ হ্যানরী বার্ড পুলিশবাহিনীকে বললেন– গ্রেপ্তার করো ওকে।

পুলিশবাহিনী ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করে ফেললো। ড্রাইভারের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলো তারা।

নূর নির্বাক।

মনিরার মুখে কোনো কথা নেই।

আরমান নূর আর মনিরার সঙ্গে নিচে নেমে এসেছে। সে অবাক কণ্ঠে বললো– আপনারা ড্রাইভারকে এভাবে গ্রেপ্তার করলেন কেন? সে কি নূরের গাড়ির ড্রাইভার।

মিঃ হ্যানরী বার্ড বললেন–আমি ভুল করিনি। ড্রাইভার বেশে এ স্বয়ং দস্যু বনহুর।

মুহূর্তে আরমানের মুখমন্ডল ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। সে বিস্ময়ভরা চোখে তাকাতে লাগলো দাড়ি–গোঁফ ঢাকা ড্রাইভারের মুখমন্ডলে।

মিঃ হ্যানরী বার্ড ড্রাইভারের মুখ থেকে দাড়ি–গোঁফ খুলে ফেললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বললেন–দেখুন।

আরমান আনন্দধ্বনি করে উঠলো–আপনি। নূর ইনিই আমাকে সেই মৃত্যুগহবর থেকে রক্ষা করেছিলেন। ইনিই সেই ব্যক্তি।

নূর কোনো কথা বললো না।

সে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে আছে।

মনিরার চোখেমুখে ভীষণ একটা দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে। কোনো কথাও বলতে পারছে না এবং স্বামীর পাশে গিয়ে কিছু বলবে তাও পারছে না। সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেলো। ভাবছে মনিরা কিছু পূর্বের ঘটনাগুলো......ভোরে ঘুম ভেঙে জেগে উঠেই মনিরা শুনতে পেলো দরজায় মৃদু আঘাতের শব্দ।

দরজা খুলে দিতেই দেখলো সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার স্বামী। আনন্দে অভিমানে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো মনিরা।

বনহুর পাশ কেটে ভেতরে প্রবেশ করে ওকে টেনে নিলো কাছে, বললো–কি, খুব আশ্চর্য হয়ে গেছে, তাই না?

মনিরা বলেছিলো–আশ্চর্য হবে কেন? জানি তুমি ধূমকেতু। তোমার আবির্ভাব যেমন তেমনি তোমার অন্তর্ধান। তা হঠাৎ কোথা থেকে হাজির হলে?

কেন তুমি প্রশ্ন করছো মনিরা? তুমি তো সবই জানো। সুযোগ পেলাম তাই চলে এসেছি। কেমন ছিলে? মা কেমন আছেন?

সে কথা নাইবা শুনলে। আমরা কেমন থাকি তা তোমার জানার কোনো দরকার করে না। মা ভাল আছেন।

আর তুমি?

বলে কাজ নেই।

মনিরা, তোমার অভিমান ভরা মুখ আমার খুব ভাল লাগে।

তাইতো তুমি ছুটে আসো।

সত্যি তাই।

তা ছাড়া তোমার কোনো দায়িত্ব নেই?

আছে কিন্তু তা পুরা করতে পারি কই মনিরা?

চিরকাল তোমার এভাবেই কাটলো।

হাঁ.........একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেলো বনহুর। তারপর একটু হেসে বললো–থাক ও সব কথা, শোন মনিরা, একটা জরুরি সংবাদ নিয়ে এসেছি।

বলো?

নূরের বন্ধু আরমানকে তুমি চেনো?

হাঁ চিনি। খুব ভাল ছেলে। হঠাৎ কে বা কারা তাকে উধাও করেছিলো। সমস্ত কান্দাই শহর এবং কান্দাইয়ের আশেপাশে সন্ধান চালিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি। পুলিশমহল এবং গোয়েন্দা বিভাগ বহু চেষ্টা করেও তাকে খুঁজে বের করতে পারেনি, এমনকি নূরও হতাশ হয়ে পড়েছিলো তার খোঁজ না পেয়ে। তারপর হঠাৎ একদিন আরমান এসে হাজির। কিন্তু সে আসার পর তাকে হসপিটালে থাকতে হলে কয়েকদিন। শুনলাম সে এখন নূরের বাংলোয় আছে।

বনহুর বলেছিলো–তুমি তাকে দেখতে যাওনি?

যাবো ভাবছি। তুমি যাবে আমার সঙ্গে। সত্যি ছেলেটা খুব ভাল এবং মহৎ। নূরের জন্য সে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। ওগো, তুমিও যদি তাকে দেখতে যাও অনেক খুশি হবে। শুনেছি ভীষণ অবস্থার শিকার হয়েছিলো সে। কোন এক মহান ব্যক্তি

নাকি তাকে সেই ভয়ংকর অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছেন। সব কাহিনী আমার শুনতে ইচ্ছা করছে।

বেশ তো আমি যাবো তোমার সঙ্গে। কিন্তু……

বলো কিন্তু কি?

আমার যাওয়াটা কি উচিত হবে? সবাই না চিনলেও এমন অনেক আছে যারা সর্বক্ষণ আমার সন্ধান করে চলেছে।

আমি শুনবো না। আজ এসেছে যখন তখন তোমাকে যেতেই হবে আমার সঙ্গে।

লক্ষীটি অবুঝ হচ্ছো কেন। আমার সন্ধানে সব সময় পুলিশবাহিনী সজাগ রয়েছে। তাদের অনেকের মোহ আছে বনহুরকে গ্রেপ্তার করে নিজকে কৃতার্থ করা।

কোন কথা শুনবো না। তোমাকে যেতেই হবে আমার সঙ্গে।

শুনবেনা যখন তখন যাবো কিন্তু তোমার গাড়ির ড্রাইভার হয়ে……কেমন রাজি?

তুমি কেমন মানুষ বলো তো? একটিমাত্র সন্তান তোমার নূর। তাকে তোমার দেখতে ইচ্ছে করে না?

করে।

তবে চলো যেভাবে তুমি যেতে চাও।

বেশ, তুমি যদি খুশি হও চলো মনিরা……।

মনিরার কানের কাছে বনহুরের শেষ কথার প্রতিধ্বনি হতে লাগলো।

ততক্ষণে বনহুরকে পুলিশবাহিনী গ্রেপ্তার করে তার হাতে হাতকড়া এবং চারপাশে অস্ত্র উদ্যত করে ধরেছে।

আরমান নূরের দক্ষিণ হাতখানা চেপে ধরে বললো–নূর, ইনি মহৎ ব্যক্তি। আমার সেই বিপদ মুহূর্তে উনি যদি আমাকে উদ্ধার না করতেন তাহলে আমার মুখ আর দেখতে পেতেনা। নূর, চুপ করে আছো কেন কথা বলো? বলো নূর?

মিঃ হ্যানরী বার্ড সশস্ত্র পুলিশবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন তাকে পুলিশ ভ্যানে তুলে নেয়ার জন্য।

বনহুরকে যখন পুলিশবাহিনী সশস্ত্র পুলিশ প্রহরায় ভ্যানে তুলে নিলো তখন বনহুর একবার মনিরার দিকে তাকিয়ে নিলো।

উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হলো।

মিঃ হ্যানরী বার্ড দস্যু বনহুরকে এত সহজে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলেন বলে তার আত্মগর্ব হচ্ছিলো। নূরের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন–আপনার বাংলোয় এসে আমি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলাম বলে অনেক আনন্দ বোধ করছি এবং আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মিঃ নূর।

নূর গম্ভীর শান্ত গলায় বললো–ধন্যবাদ মিঃ হ্যানরী বার্ড।

মিঃ হ্যানরী বার্ড ভ্যানের ড্রাইভ আসনের পাশে চেপে বসলেন, তারপর গাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দিলেন তিনি।

দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো পুলিশ ভ্যানটি। যেমন আচমকা এসেছিলো তেমনি বেরিয়ে গেলো দ্রুতগতিতে। সামান্য সময়ে মিঃ হ্যানরী বিশ্ব জয় করে ফিরে গেলেন যেন। এক রাশ বিস্ময় আর স্তব্ধতা ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন সবার মনে।

নুর আর মনিরা নির্বাক, কোনো কথাই তাদের মুখ দিয়ে বের হলো না।

আরমান রাগ–অভিমান আর ক্ষুব্ধ ভাব নিয়ে বলে উঠলো–নূর, তোমরা এমন হতবাক হয়ে পড়েছো কেন? আমি আশ্চর্য হলাম উনি সেই ব্যক্তি যে আমাকে ভয়ংকর বিপদ হতে উদ্ধার করেছিলেন। ওর দয়ায় আমি আবার তোমাদের মধ্যে ফিরে আসতে পেরেছি। পৃথিবীর আলো দেখতে পেয়েছি।

নূর, আরমানের পিঠে হাত রেখে বললো–সব শুনেছি এবং জেনেও আমাকে নীরব থাকতে হলো আরমান। কারণ যাকে ওরা গ্রেপ্তার করলেন–সে স্বয়ং দস্যু

বনহুর।

না, আমি বিশ্বাস করি না নূর। মিথ্যা কথা, উনি কিছুতেই দস্যু বনহুর হতে পারেন না। আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। নূর, তুমি জেনেও কেন কথা বললে না? কেন তুমি নীরব ভূমিকা পালন করলে?

ও কিছু নয় আরমান। যা হবার হয়েছে। চলো আম্মি, উপরে চলো।

মনিরা নীরবে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো।

নূর ও আরমান তারাও এলো।

যে মন নিয়ে তারা এসেছিলো সে মন আর এখন কারও রইলো না। সবাই কথা বলছে কিন্তু প্রাণহীন সে কথা–বার্তা।

দুঃখ আর বেদনা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আরমান বলে চললো তার সেই নির্মম অবস্থার কাহিনী।

নূর এবং মনিরা স্তব্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছিলো।

মাঝে মাঝে মনিরার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসছিলো, নিজকে অতিকষ্টে সামলে নিচ্ছিলো

আরমান লক্ষ না করলেও নূরের দৃষ্টি এড়ায়নি।

*

পুলিশ ভ্যানখানার পেছনে আরও বেশ কয়েকখানা পুলিশ ভ্যান এগিয়ে চলেছে। প্রত্যেকটি পুলিশের হাতে এক একটি আগ্নেয় অস্ত্র। অস্ত্রগুলো বনহুরের দিকে উদ্যত করে রাখা হয়েছে।

বনহুর বসে আছে পুলিশ বেষ্টনীর মাঝামাঝি। বুদ্ধিদ্বীপ্ত চোখ দুটি তার মাঝে মধ্যে পুলিশদের চোখে এবং পায়ের দিকে স্থির হচ্ছিলো।

মিঃ হ্যানরী বার্ড যে অত্যন্ত চালাক লোক এটা বেশ বুঝতে পেরেছে। তাকে অত্যন্ত কৌশলে গ্রেপ্তার করা হলো। না হলে বনহুরকে গ্রেপ্তার করে এমন সাধ্য

কার।

হ্যানরী বার্ড কান্দাই আসার পর সর্বক্ষণ ডায়রীগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করতেন। সব খুঁটিনাটি ব্যাপার তিনি গভীরভাবে তদন্ত করে দেখতেন। সবকিছুর খোঁজখবর মিঃ হ্যানরী সহ করেছিলেন অল্পদিনের মধ্যে এবং তিনি সেইভাবে সবার অলক্ষ্যে কাজ শুরু করেছিলেন। বনহুরকে গ্রেপ্তার করাই ছিলো তার মূল উদ্দেশ্য এবং এ কারণেই তিনি কান্দাই শহরে এসেছেন। তার প্রচেষ্টা সার্থক হলো। তিনি নিজেও ভাবতে পারেননি এত সহজে কার্যোদ্ধার হবে।

বনহুরকে পুলিশ বেষ্টনীতে আটক করে নিয়ে যাওয়া হলো হীমাগার কারাগারে।

হিন্দোল নামক দ্বীপে এই কারাগার অবস্থিত।

প্রথমে পুলিশ ভ্যানে তারপর জাহাজে কান্দাই সাগর অতিক্রম করে হিন্দোল দ্বীপে পৌঁছতে হলো। বনহুরকে গ্রেপ্তার করার পর তার হাত দুখানা মুহূর্তের জন্যও মুক্ত করা হলো না। পুলিশমহল জানে একবার যদি কোনোক্রমে বনহুরের হাত দুখানা মুক্ত হয় তা হলে তাকে আটক করে রাখার সাধ্য কারো নেই।

এ কারণেই পুলিশমহল অত্যন্ত সজাগ এবং সতর্কতার সঙ্গে বনহুরকে নিয়ে যাচ্ছিলো।

পুলিশ ভ্যান থেকে যখন বনহুরকে জাহাজে নেয়া হলো তখন কমপক্ষে পাঁচশ সশস্ত্র পুলিশ তাকে পাহারা দিয়ে রেখেছিলো যেন সে কোনোক্রমে পালাতে না পারে।

জাহাজে উঠানোর পর তাকে এমন একটি ক্যাবিনে রাখা হলো যে ক্যাবিন থেকে সে কিছুতেই বেরুতে পারবে না। তারপর রইলো অগনিত পুলিশ।

বনহুর এভাবে বন্দী হয়ে এসে পৌঁছলে হিন্দোল দ্বীপে। তাকে অত্যন্ত সাবধানে হীমাগার কারাগারে বন্দী করা হলো। হীমাগার কারাগার এক ভয়ংকর স্থান। যেখানে বন্দী করে রাখা হয় মহাদোষী ব্যক্তিদের। তাদের দেয়া হয় চরম শাস্তি। বনহুরকে সেই হীমাগারে আটক করে রাখা হলো।

*

জাভেদ, তুমি না একবার সর্দারকে হাঙ্গেরী কারাগার থেকে উদ্ধার করে এনেছিলে? এবার সে হীমাগারে বন্দী অবস্থায় রয়েছে, তুমি কি তাকে এবার উদ্ধার করে আনতে পারো না। কথাগুলো বললো ফুল্লরা জাভেদকে লক্ষ্য করে।

জাভেদ শুধু তাকিয়ে শুনলো কথাগুলো কিন্তু কোনো জবাব দিলো না। তার মধ্যে কোনো ভাবের পরিবর্তনও দেখা গেলো না।

ফুল্লরা পুনরায় বললো–জাভেদ, তুমি কি কিছু বোঝ না?

জাভেদ তবু নিরুত্তর।

আবার বললো ফুল্লরা–সর্দার তোমার পিতা তোমার বাপু–তাও কি সম্পূর্ণ ভুলে গেছো?

এবার জাভেদ কোনো জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

তার সামনে খাবারের থালা।

ফুল্লরা অনেক কষ্ট করে রোজ খাওয়ায়, নইলে জাভেদ খেতেই চায় না। আজও ফুল্লরা ওকে মুখে তুলে খাওয়াচ্ছিলো আর সেই মুহূর্তে কথাগুলো বলছিলো।

বললো ফুল্লরা–খেয়ে নাও বলছি।

এবার জাভেদ চোখ তুলে তাকালো ফুল্লরার মুখের দিকে। কারণ ফুল্লরার কণ্ঠে ছিলো আদেশের সুর।

ফুল্লরা ওকে কঠিনভাবে শাসন করতো নইলে জাভেদকে সহজে বাগানো যেতো না। এখন জাভেদের কিছুটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ফুল্লরা যা বলে সেটা না মেনে নিয়ে পারে না জাভেদ।

ফুল্লরা যখন রাগ করে বললো, খেয়ে নাও বলছি......তখন সে ফুরার মুখের দিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিলো তারপর বাধ্য ছাত্রের মত এসে বসলো তার পাশে।

ফুল্লরা ওর মুখে খাবার তুলে দিতে লাগলো।

ফুল্লরা যখন জাভেদের মুখে খাবার তুলে দিচ্ছিলো ঠিক তখন আশা আর হুমায়রা উপস্থিত হলো সেখানে।

হুমায়রা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

বুকটা তার ভীষণভাবে ধক্ করে উঠলো। এ দৃশ্য তার সমস্ত শরীরের রক্ত উষ্ণ করে তুললো। তার ইন্দ্রনাথ এখানে আর তার পাশে একটি তরুণী।

হুমায়রার মুখোভাব লক্ষ করে আশা বিচলিত হলো। আশা জানতো ফুল্লরার বেষ্টনীতে জাভেদ বন্দী। হুমায়রার সেখানে কোনো স্থান নেই তবুও আশা বাধ্য হয়েছে হুমায়ারকে এখানে আনতে। কারণ হুমায়রা জাভেদের সন্ধানে উন্মাদিনী হয়ে পড়েছিলো। একদম সে মুখে কিছু দিতো না, কিছুতেই খাওয়াতে পারতো না আশা ওকে।

এমনি করে কদিন বাঁচবে হুমায়রা।

আশা হুমায়রার এ অবস্থা সহ্য করতে না পেরে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো। ওকে বাঁচানো কিছুতেই সম্ভব নয়, যদি সে জাভেদকে দেখতে না পায়। তাই বাধ্য হয় আশা ওকে এখানে আনতে।

হুমায়রা যখন দেখতে পেলো তার ইন্দ্রনাথ এখন অপর এক জনের হাতে, মুহূর্তে তার মাথায় কে যেন বজ্রপাত করলো।

জাভেদও হুমায়রার দিকে তাকালো। হুমায়রাকে চিনতে পারলো জাভেদ, উঠে তার দিকে এগিয়ে আসার জন্য পা বাড়াতেই ফুল্লরা ওর হাত চেপে ধরলো। হুমায়রাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছে ফুল্লরা, ওই তরুণীর পাশেই যে দেখেছিলো জাভেদকে একেবারে ঘনিষ্ঠ অবস্থায়, তাই সে সেদিন নিজেকে সংযত রাখতে পারেনি নিজের দেহরক্ষাকারী ছোরাটি নিক্ষেপ করেছিলো ওকে লক্ষ্য করে। তাহলে মরেনি ও......ফুল্লরার মুখমন্ডলে ক্রুদ্ধ ভাব ফুটে উঠলো।

হিংস্র দৃষ্টি নিয়ে তাকালো ফুল্লরা ওর দিকে।

হুমায়রা ছুটে বেরিয়ে গেলো যে পথে সে এসেছিলো আশার সঙ্গে সেই পথে।

আশা ওকে ধরবার জন্য এগিয়ে গেলো কিন্তু সে পারলো না হুমায়রা দ্রুত বেগে চলে গেলো গহন বনের অন্তরালে।

আশাও ছুটলো হুমায়রাকে ধরার জন্য। তার সঙ্গে নাসরিন এবং নূরী।

বনহুরের অনুচরগণও পরে হুমায়রাকে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা চালালো কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেলো না।

বিফল মনোরথ হয়ে আশা ফিরে এলো নিজের কুটিরে কিন্তু সব শান্তি সে বিসর্জন দিয়ে এলো বনহুরের আস্তানায়। শুধু হুমায়রাকেই হারায়নি সে, বনহুরকে হীমাগারে আটক করা হয়েছে এ সংবাদ আশা জানলো সেখানে।

রহমান তাকে কথাটা জানিয়েছে।

হিন্দোল দ্বীপের রাজা নীলকান্ত তৈরি করেছিলেন এই হীমাগার। অদ্ভুত সে কাহিনী, হীমাগার নিয়ে নানা রকম কথা শোনা যায় জনসমাজে।

রাজা নীলকান্ত কেন এই হীমাগার তৈরি করেছিলেন এ ব্যাপার নিয়েও নানাজনের নানা ধরনের মতবাদ আছে। কেউ বলে হীমাগার তৈরি করেছিলেন দেশদ্রোহীদের কঠিন শাস্তি দেয়ার জন্য। কেউ বলে হীমাগার তৈরি করেছিলেন রাণী মতিবাঈকে বন্দী করে রাখার জন্য। অবশ্য এ কথা সত্য, রাণী মতিবাঈকে রাজা নীলকান্ত এই হীমাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন কোনো এক কারণে। এই হীমাগারেই রাণীর মৃত্যুও ঘটেছিলো একদিন।

শোনা যায়, রাজা নীলকান্ত হিন্দোল দ্বীপেরই শুধু রাজা ছিলেন না, তিনি আশেপাশে সমস্ত জলসীমার রাজা ছিলেন। তার মতামত না নিয়ে কোনো জাহাজ কোনো সময় এসব সাগর নদ নদী অতিক্রম করতে পারতো না।

রাজা নীলকান্তের অনুচরগণ সদাসর্বদা এই সব জলপথে প্রহরায় রত থাকতো। কোনো জাহাজ ভুলক্রমে এই পথে প্রবেশ করলে তাদের চরম জরিমানার সম্মুখীন হতে হতো। অনেক সময় জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বন্দী করে রাখা হতো এবং তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হতো হীমাগারে বন্দী করে রেখে।

সেই হীমাগারে বন্দী করে রাখা হলো দস্যু বনহুরকে।

বহুকালের পুরোন এই হীমাগার এখন হিন্দোল সরকারের আয়ত্তে। এখানে বাইরের কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। নীলকান্ত রাজা এখন নেই, আছে তার ভগ্ন রাজপ্রাসাদ, আছে তার হীমাগার–বন্দীশালা।

এই বন্দীশালা এখনও কোনো কোনো রাষ্ট্র ব্যবহার করে থাকেন, অবশ্য সম্মতি গ্রহণ করতে হয় হিন্দোল সরকারের নিকটে।

বনহুরকে বন্দী করে রাখার পেছনেও কান্দাই সরকারকে হিন্দোল সরকারের অনুমতি গ্রহণ করতে হয়েছে।

হিন্দোল দ্বীপে যখন বনহুরকে আনা হলো তখন হিন্দোল দ্বীপবাসী তাকে একনজর দেখার জন্য জাহাজঘাটে ভীড় জমিয়ে ছিলো। যুবক–বৃদ্ধা, নারী–পুরুষ এমনকি শিশুরাও বনহুরকে দেখার জন্য উগ্রীব।

বনহুর হিন্দোল কারাগারে বন্দী।

কথাটা যখন আশার কানে গেলো তখন সে নিশ্চুপ থাকতে পারলো না।

হুমায়রার সন্ধান ত্যাগ করে আশা তার নিজ অশ্ব নিয়ে হিন্দোল অভিমুখে ছুটলো। অশ্বযোগে যতদূর যাওয়া সম্ভব তাই সে যাবে তারপর জাহাজ রয়েছে। জাহাজে সে হিনোল পৌঁছবে এবং পুরুষ ছদ্মবেশ নিয়ে বনহুরকে উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করবে। তাই আশা তার ছদ্মবেশ ধারণের সবকিছু সঙ্গে নিলো। আরও সঙ্গে নিলো আগ্নেয় অস্ত্র ক্ষুদে রিভলভার।

আশা জানে কত ভয়ংকর সেই হীমাগার।

সেখানে বনহুর প্রতিটি মুহূর্ত কিভাবে কাটাবে তা চিন্তাতীত ব্যাপার।

আশা তার নিজ অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো।

অশ্ব তাকে নিয়ে উল্কাবেগে ছুটে চলেছে। গভীর জঙ্গল অতিক্রম করে এবং শুধু প্রান্তর পেরিয়ে একদিন সে ঝম দেশে এসে পৌঁছলো।

ঝাম অতিক্রম করার সময় আশা পুরুষ ড্রেসে সজ্জিত হলো।

কোনো এক নঙ্গরখানায় তাকে রাত কাটাতে হলো। কেউ যেন তাকে নারী বলে চিনতে না পারে সেজন্য অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে থাকতে হলো। তবুও তার আশঙ্কা সে যে নারী কখন প্রকাশ পেয়ে যায়। তা হলে আবার তাকে নানা কৈফিয়ত দিতে হবে।

ভাগ্য তার প্রসন্ন তাই সে রাত ভালোয় ভালোয় কেটে গেলো।

পরদিন আবার সে রওয়ানা দিলো।

ঝম শহর ছেড়ে তাকে আরাকান বন্দরে পৌঁছতে হলো। সেখানে আশা এক শ্রমিকের বাড়িতে আশ্রয় নিলো। শ্রমিকটির বৃদ্ধা স্ত্রী প্রথমে তাকে আশ্রয় দিতে চায় না। আশা তাকে মা বলে সম্বোধন করলো, এবং তার হাতে গুঁজে দিলো একটি মোহর।

মোহর পেয়ে বৃদ্ধার দু চোখ কপালে উঠলো। সোনার মোহর–এ যে তাদের কল্পনার বাইরে। তারা শ্রমিক, নেহাত গরিব মানুষ। ছেলেপেলে তাদের নেই, তাই বৃদ্ধ বয়সেও শ্রমিকটিকে রীতিমত খাটতে হয় এমন কি বৃদ্ধাও কাজ করে। দুজনের উপার্জনে চলে তাদের সংসার।

আশা মোহর দিয়ে বললো–মা, তোমাদের দুঃখ আমাকে ব্যথিত করেছে। আমি তোমাদের ছেলের মত।

বৃদ্ধা খুশিতে ডগমগ হয়ে বলে–নিশ্চয় তুমি আমাদের ছেলের মত। সত্যি তুমি খুব ভাল বাবা। তোমার নাম কি বাবা?

আশা বললো–রণজিৎ।

বাঃ বাঃ সুন্দর নাম তোমার। আমার দাদুর নাম ছিলো রনসিং। যাক, তোমাকে পেয়ে আমরা খুব খুশি হয়েছি। আমরা নিঃসন্তান, তোমাকে আমরা সন্তান বলেই জানবো।

হাঁ, আমিও তোমাকে মা আর ওকে বাবা বলে ডাকবো। শোন মা?

বলো বাবা কি বলতে চাও?

আজ তোমার এখানে খাবো, তারপর আমি চলে যাবো, শুধু আমার অশ্বটা থাকবে তোমাদের এখানে। ওকে কদিন তোমরা যত্ন করে রেখো, ঠিকমত খেতে দিও। আমি ফিরে এসে আরও চারটে এই জিনিস দেবো।

সত্যি বলছো বাবা?

হাঁ সত্যি। কোনো দিন আর তোমাদের কাজ করে খেতে হবে না। ঐ টাকায় ব্যবসা করবে আর বসে বসে খাবে।

কোথায় যাবে বাবা?

বন্ধুর ওখানে।

বন্ধু!

হাঁ।

কোথায় আছে সে?

হিন্দোল দ্বীপে।

ঐ ভয়ংকর দ্বীপে আছে তোমার বন্ধু

বৃদ্ধার দুচোখে কেমন যেন আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠলো। আশা সেটা লক্ষ্য করে বললো–ভয়ংকর দ্বীপ?

হাঁ, ঐ দ্বীপে আমার একমাত্র সন্তান হীরা মরেছে। আমার নয়নের মনি হীরা……বৃদ্ধা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, তার ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগলো বেতসপত্রের মত।

অদূরে ছিলো শ্রমিক বৃদ্ধটি, সে এতক্ষণ বসে বসে শুনছিলো তাদের কথাবার্তা, এবার সেও অশ্রু ছলছল কণ্ঠে বলে–ঐ দ্বীপ আমাকে নির্বংশ করেছে। আমরা সন্তানহারা হয়েছি।

কি ঘটনা বলবে আমাকে বললো আশা।

বৃদ্ধা এবার সরে এলো তার পাশে, বললো সে–আমার ছেলে হীরা ছিলো খুব সাহসী। সে জাহাজের নাবিকের কাজ করতো। একবার সে হিন্দোল দ্বীপে গেলো তাদের জাহাজে। কোনো কারণে হিন্দোল সরকার জাহাজখানাকে আটক করলো আর জাহাজের নাবিকদের বন্দী করলো। আমার ছেলে হীরাও বন্দী হলো নাবিকদের সঙ্গে। তারপর বিচার হলো, বিচারে নাবিকদের শাস্তি দেয়ার আদেশ হলো। আমার হীরাও রেহাই পেলো না। যারা বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলো তাদের হীমাগারে আটক করে রাখা হলো। কিন্তু আমি যখন এ সংবাদ পেলাম তখন আর সময় ছিলো না। দীর্ঘ কয়েক মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। আমি যখন হিন্দোল পৌঁছলাম তখন শুনলাম হীমাগারে আটক নাবিকগণ সবাই মরে গেছে, একজনও জীবিত নেই। মাথায় আমার আকাশ ভেঙে পড়লো। আমি ছুটলাম সেই সর্বনাশা হীমাগারের দিকে। সেখানে পৌঁছে দেখলাম হীমাগারের সামনে অসংখ্য মানুষের ভীড় জমে উঠেছে। আমি উন্মাদের মত ভীড় ঠেলে সেখানে উপস্থিত হয়ে যে দৃশ্য দেখলাম তা আজও আমাকে ভয়ার্ত করে তোলে। দেখলাম প্রায় এক শতজন লোককে শুইয়ে রাখা হয়েছে। সবাই জমে বরফ হয়ে গেছে। আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম ঠিক মাঝামাঝি শুয়ে আছে আমার হীরা। আমি আছড়ে পড়লাম তার বুকের উপর? উঃ! সেকি ঠান্ডা......আমার হাত আর এই বুকটা জমে গেলো এক মুহূর্তে। তারপর আমার আর কিছু মনে ছিলো না। যখন জ্ঞান হলো তখন দেখলাম, আমার দেহটা ঝাঁকুনি খাচ্ছে। ভাল ভাবে তাকিয়ে বুঝলাম আমি জাহাজে শুয়ে আছি এবং জাহাজখানা তখন সাগরের বুকে দোল খেয়ে খেয়ে ছুটে চলেছে। কেউ আমাকে বললো ভাগ্যিস তোমার পকেটে তোমার ঠিকানা আর নামটা ছিলো। নইলে তোমার আর দেশে ফেরা হতো না। এতোগুলো কথা একসঙ্গে বলে বৃদ্ধা হাঁপাতে লাগলো।

আশা বললো–এবার বুঝেছি তোমার সব কথা কিন্তু......

বল থামলে কেন? বললো বৃদ্ধ।

আশা বললো–আমার বন্ধুটিও যে ঐ হীমাগারে বন্দী আছে।

সর্বনাশ! তাহলে সেকি আর জীবিত আছে? বৃদ্ধা কথাটা হতাশার সুরে বললো।

আশার চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠলো।

বৃদ্ধ এবার অট্টহাসি হেসে উঠলো।

আশ্চর্য হয়ে তাকালো আশা তার মুখের দিকে।

বললো আশা– কি হলো তোমার বাবা?

তোমার বন্ধু যদি জীবিত থাকে তাহলে আমি তাকে উদ্ধারের পথ বাতলে দেবো, আর যদি জীবিত না থাকে তাহলে তোমাকে ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হবে। তাই আমি হাসলাম, কারণ হীমাগারের অনেক বন্দীকে আমি বের করে এনেছি।

সত্যি! সত্যি বলছো বাবা?

হাঁ, সত্যি বলছি।

পারবে? পারবে তুমি আমার বন্ধুকে উদ্ধার করে আনতে!

পারবোযদি সে বেঁচে থাকে। আমার হীরা হীমাগারে হীম হয়ে মরে যাওয়ার পর আমি জেদ করেছিলাম ঐ কারাগারে আর আমি কাউকে মরতে দেবো না। তারপর থেকে আমি নানাভাবে হীমাগারে প্রবেশ করবার পথ খুঁজতে শুরু করলাম। হাঃ হাঃ হাঃ পথ আমি পেয়ে গেলাম। হীমাগারের গোপন পথ, যে পথে জমে যাওয়া মৃতদেহগুলো সাগরে ফেলা হতো সেই পথ। হিন্দোল সরকার এ পথের সন্ধান জানে না। রাজা নীলকান্তের তৈরি এ পথ অতি গোপনপথ। আমি, আমি তোমাকে সেই পথে নিয়ে যাবো হীমাগারে। হাঃ হাঃ হাঃ কেউ জানবে না কেউ দেখবে না তোমাকে.......

আশার দুচোখে খুশির উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে। দুহাতে বৃদ্ধের হাত ধরে বলে–তুমি আমাকে নিয়ে চলো বাবা, আমি তোমাকে দশটি মোহর দেবো।

মোহর আমি চাই না যুবক, আমি চাই আমার হীরার শাস্তি দাতাদের শাস্তি দিতে। যারা আমার হীরাকে হত্যা করেছে তাদের প্রতিশোধ নিতে। একটু থেমে বললো সে–জানি আমি তাদের শাস্তি দিতে পারবো না। প্রতিশোধ নিতে পারবো, যাকে তারা হীমাগারে আটক করে রাখবে আমি তাদের মুক্ত করে দেবো। আজ পর্যন্ত আমি বহু বন্দীকে সেই গোপন পথে মুক্ত করে এনেছি। তারা আজও আমার কাছে আসে এবং কৃতজ্ঞতা জানায়। আমি তাদের সবাইকে হীরার মতই ভালবাসি......বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর।

আশার মনে একটা আশার আলো জ্বলে ওঠে। বৃদ্ধকে তার সবচেয়ে প্রয়োজন এই মুহূর্তে। শ্রমিক বৃদ্ধ তাকে পথের সন্ধান দেবে, সত্যি বড় খুশির কথা।

আশা বৃদ্ধা শ্রমিকসহ জাহাজে উঠে বসলো একদিন। যাত্রা শুরু হলো হিনলালের পথে।

*

বিস্ময়কর সেই গোপন পথ।

শ্রমিক বৃদ্ধ সম্মুখভাগে পেছনে পুরুষের ছদ্মবেশে আশা। এগিয়ে যাচ্ছে ওরা দুজন। চারপাশে নানা ধরনের আগাছা আর দুর্গম অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ। অতিকষ্টে এগুচ্ছিলো তারা।

খুব কষ্ট হচ্ছিলো তাদের।

তবুও তারা চলেছে।

সমুদ্রতীর বেয়ে গভীর মাটির তলা দিয়ে এই পথ চলে গেছে হীমাগারের এক গোপন গুহায়। সুড়ঙ্গপথটি নানা ধরনের আগাছা আর কঠিন পাথরের নুড়িতে ভর্তি। পথ চলতে বেগ পেতে হচ্ছিলো। মাঝে মাঝে মোমবাতি জ্বালিয়ে পথ দেখে নিচ্ছিলো বৃদ্ধ শ্রমিকটি।

আশা আশংকিত হচ্ছিলো, কারণ হঠাৎ যদি কেউ দেখে ফেলে তাহলে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে না। কাজেই সাবধানে এগুনো দরকার।

হীমাগারের চারপাশে অত্যন্ত কঠিন আর সজাগভাবে প্রহরীগণ পাহারায় রত। বিশেষ করে এখন আরও বেশি সর্তকতার সঙ্গে প্রহরিগণ পাহারা দিচ্ছে। কারণ দস্যু বনহুর আটক রয়েছে। এখানে। সে যেন পালাতে না পারে।

ভূগর্ভ পথে এগিয়ে যাচ্ছে আশা আর বৃদ্ধ।

বিষধর সাপের ভয়ও আছে। মৃত্যুভয়ে ভীত নয় বৃদ্ধ। এ ভাবেই সে অনেক বন্দীকে অতি কৌশলে হীমাগার থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। আজও বৃদ্ধ অনেক আশা নিয়ে এসেছে নির্ভীক সৈনিকের মত।

এক সময় আশা অনুভব করে শরীরে ভীষণ ঠান্ডা লাগছে। হীমশীতল পরশ কে যেন তার দেহে ঢেলে দিচ্ছে। বললো আশা চাপাকণ্ঠে–বাবা, এমন ঠান্ডা লাগছে কেন?

বললো শ্রমিক বৃদ্ধ–ঠান্ডা লাগবে–আরও ঠান্ডা লাগবে। যে ঠান্ডা আমার হীরাকে বরফ করে দিয়েছিলো।

বৃদ্ধের কথা মিথ্যা নয়, ক্রমেই ঠান্ডা কঠিন হয়ে আসছে। আশার শরীর জমে যাবার উপক্রম হলো। হঠাৎ একটা শব্দ কানে এলো আশার–কেউ যেন শব্দ করছে উঃ আঃ আঃ....

আশা বললো–বাবা, শুনছো মানুষের গলার স্বর।

হাঁ, শুনতে পাচ্ছি। বললো বৃদ্ধা।

কিছুটা এগুতেই শব্দটা আরও স্পষ্ট শোনা গেলো। বললো আশা–নিকটে কোথাও কেউ আছে....সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলো অদূরে–কেউ দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে।

শ্রমিক বৃদ্ধ ম্যাচ জ্বেলে মোমবাতি ধরালো।

আশার দৃষ্টি সেইদিকে পড়তেই চমকে উঠলো। আনন্দসূচক শব্দ করে ছুটে গেলো, বনহুর তুমি......মোমের আলোতে দেখলো বনহুরের হাত দুখানা পিছমোড়া করে বাধা, তার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি–গোঁফ। চোখ দুটো বন্ধ।

বললো আশা–বনহুর, চোখ মেলে দেখ, আমি এসেছি।

বনহুর অতিকষ্টে চোখ মেলে তাকালো, মোমের আলোতে দেখলো এক তরুণ তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে আর একজন বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে–হাতে তার মোমবাতি।

বনহুর প্রথমে আশাকে চিনতে পারলো না। আশা বললো–তোমার কোনো চিন্তা নেই বনহুর। আমি আশা, তোমাকে মরতে দেবো না।

বনহুরের ঠোঁটের কোণে খুশির আভাস ফুটে উঠলো, চোখ দুটো ভাল করে মেলে ধরে দেখতে চেষ্টা করলো আশার মুখখানা।

আশা আর বৃদ্ধ বনহুরকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিতে গেলো। এত ঠান্ডা কিছু বুঝি কোনো দিন তারা স্পর্শ করেনি।

বৃদ্ধ আর আশা ধরে রাখলো বনহুরাকে।

বনহুর ধীরে ধীরে বললো–আশা, তুমি এখানে কেমন করে এলে?

বললো আশা–সব পরে জানতে পারবে। এখানে আমাদের দেহের রক্ত জমে যাবার উপক্রম। হয়েছে।

বললো বনহুর–এ পথ তোমরা কেমন করে চিনলে আশা

বৃদ্ধ শ্রমিকটিকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললো আশা–এই বাবা আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে।

বৃদ্ধ বললো–তুমি তোমার বন্ধুকে পেয়ে গেছে, আর বিলম্ব করা উচিত হবে না।

হাঁ চলো বাবা। বললো আশা।

বনহুর বললো–আর দুটো দিন বিলম্ব হলে আমি বরফ হয়ে যেতাম আশা। জানিনা কেমন করে আমি এ পথ আবিষ্কার করে ছিলাম। এখানে ঠান্ডা কিছু কম তাই এখনও বেঁচে আছি……

চলো বনহুর, আমাদের শক্ত করে ধরো, তারপর পা ফেলো।

বনহুর আশা আর বৃদ্ধ শ্রমিকটির দেহে ভর করে একসময় বেরিয়ে এলো হীমাগারের গোপন সুড়ঙ্গপথ দিয়ে বাইরে।

হীমাগারের ভেতর থেকে পৃথিবীর আলো–বাতাসে এসে দাঁড়াতেই পৃথিবীর বাতাস সমস্ত শরীরকে যেন উষ্ণ করে তুললো। হীমাগারের হীম ঠান্ডা এখানে আর নেই। সুড়ঙ্গমুখ থেকে কিছুটা দূরে এসে দাঁড়ালো ওরা তিনজন।

বনহুরের হাত দুখানা তখনও পিছমোড়া করে বাঁধা। চলতে খুব কষ্ট হচ্ছে, কারণ সমস্ত দেহটা যেন জমে বরফ হয়ে গেছে।

চারদিকে অন্ধকার।

বৃদ্ধ শ্রমিকটির নিকটে দিয়াশলাই ছিলো।

ম্যাচ জ্বেলে শুকনো পাতায় আগুন জ্বাললো সে। আশা তখন বনহুরের মাথাটা কোলে রেখে হাত দুটো দিয়ে তার কপালের ঠান্ডা দূর করার চেষ্টা করছিল। তার বুকেও হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো আশা।

বৃদ্ধ শুকনো পাতা আর শুকনো ডালপালা নিয়ে আগুনটা আরও জোরালো করে তুললো। বৃদ্ধের প্রচেষ্টা ওকে সজীব করে তুললো। ঠান্ডায় জমে যাওয়া রক্ত গরম হয়ে উঠলো।

আশার শরীরে ছদ্মবেশ থাকলেও বনহুর তার কণ্ঠস্বরে তাকে চিনতে পেরেছিলো এবং তাকে কোনো প্রশ্ন বনহুর করেনি তার ড্রেস সম্বন্ধে।

একসময় ভোর হয়ে এলো।

সূর্যের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ধরিত্রীর বুক। সোনালী সূর্যের আলোতে চিক্ চিক্ করছে সম্মুখস্থ বনভূমির সবুজ পাতাগুলো।

এখন অনেকটা সুস্থ বোধ করছে বনহুর।

আশার সেবা-যত্নের কোনো ত্রুটি ছিলো না।

বৃদ্ধ শ্রমিকটি বন থেকে কিছু ফল সংগ্রহ করেছিলো সেই ফল তারা বনহুরকে খাওয়ালো এবং নিজেরাও খেলো।

গভীর জঙ্গল একদিকে—অপর দিকে সমুদ্র। মাথার উপরে নীল আকাশ।

বৃদ্ধ আর আশার সাহায্যে বনহুর বেরিয়ে এসেছে হীমাগারের কঠিন মৃত্যুকূপ হতে। আর মাত্র দুটি দিন বিলম্ব হলে বনহুরকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যেতো না।

আশা মনপ্রাণে সৃষ্টিকর্তার নিকটে কামনা করেছিলো বনহুরকে যেন জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়। সে আশা সফল হয়েছে, আনন্দে চোখ দুটো তার চক্ চক্ করছে।

বনহুরের হাত দুখানায় হাতকড়া পরানো থাকায় সে নিজে খেতে পারছিলো না। বড় অসুবিধা হচ্ছিলো তার তবু উপায়হীন তারা ঐ মুহূর্তে।

আশা নিজ হাতে ফলমূল তুলে খাওয়াচ্ছিলো। চুলগুলো ছড়িয়ে আছে কপালে। আশা আংগুল দিয়ে সরিয়ে দিলো, তারপর বললো–সত্যি বনহুর, তোমার কষ্ট আমার অন্তরকে বিদ্ধ করছে। তোমার হাতের হাতকড়া খুলে না ফেলা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই।

ইচ্ছা করলে পারো–আমার হাত দু খানাকে মুক্ত করতে।

বলো কেমন করে পারবোর বললো আশা।

একটি পাথরে আমার হাত দুখানা রেখে অপর একটি পাথরের নুড়ি দিয়ে ঠিকভাবে আঘাত করতে পারলে...

সত্যি এই বুদ্ধিটুকু আমাদের এতক্ষণ মাথায় আসেনি। আশার দুচোখে আনন্দোচ্ছাস ফুটে উঠলো। সে তাড়াতাড়ি বনহুরের হাত দুখানা মুক্ত করার জন্য পাথরের নুড়ির সন্ধানে ছুটলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পেয়ে গেলো আশা পাথরের নুড়ি এবং একটি বড় পাথর। যার উপরে হাত রেখে ছোট নুড়ি দিয়ে আঘাত করবে।

শ্রমিক বৃদ্ধ এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করলো।

বনহুরের হাত দুখানা একসময় মুক্ত হলো। দীর্ঘ সময় হাত দুখানা বাঁধা থাকায় বেশ ব্যথা হয়ে গিয়েছিলো।

আশা হাত বুলিয়ে তার ব্যথা লাঘব করার চেষ্টা করতে লাগলো।

বনহুর একটি বড় পাথরে হেলান দিয়ে আশার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলো।

আশার চোখ দুটো চলে যায় বনহুরের চোখের দিকে। বনহুর নির্বাক চোখে তাকিয়ে আছে, দেখে লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে আশার মুখমন্ডল।

বনহুর বলে–সত্যি আশা, তোমার কাছে আমি চিরঋণীই শুধু নই, আমি চিরকৃতজ্ঞ। কতবার তুমি আমায় বাঁচালে.........

শুধু শুধু তুমি বাড়িয়ে বলছে বনহুর। যতটুকু আমার কর্তব্য আমি ততটুকুই করেছি।

কিন্তু কেন তুমি আমার জন্য এত করো?

আমার মন বলে, তাই.......

আশা!

বলো?

সত্যি তোমার প্রশংসা না করে পারি না। একমাত্র নারী তুমি যার মধ্যে নেই কোনো স্বার্থ। একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলে বনহুর–স্বার্থহীন মানবীবেশী দেবী তুমি।

আমার চেয়ে তোমার উপকারে এসেছে এই পাথরের নুড়িটা বেশি। ওটা না হলে তোমাকে ঠিক মুক্ত করাই হতো না।

বনহুর আশার হাত থেকে ছোট্ট নুড়িটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে। বলে বনহুর–বড় সুন্দর এ নুড়িটা। এটা তুমি কোথায় পেয়েছিলে আশা?

বলে আশা–অনেক খোঁজার পর আমি ঐ নুড়িটা পেয়েছি বনহুর। সত্যি নুড়িটা ভারী সুন্দর।

বললো বনহুর–আশা, তোমার পরশে নুড়িটা এত সুন্দর হয়েছে।

না, তোমার পরশে। ও তোমার হাতের বাঁধন মুক্ত করতে পেরে খুশিতে এমন উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করেছে..

এমন সময় ফিরে আসে শ্রমিক বৃদ্ধটা।

তার কোঁচড়ে একরাশ ফল।

কিন্তু একি! তার বুক থেকে রক্ত ঝরছে। টলছে ওর দেহটা। আশা তাড়াতাড়ি ধরে ফেললো। দ্রুতহস্তে।

বনহুরও উঠে তাকে ধরে ছিলো।

বৃদ্ধের বুক ভেদ করে চলে গেছে বুলেট, তাই তার বুক থেকে রক্ত ঝরছে আর টলছে তার পা দুখানা। বনহুর আর আশার মুখমন্ডল ফ্যাকাশে রক্তশূন্য হয়ে পড়লো। তারা উভয়েই তাকালো উভয়ের মুখের দিকে।

শ্রমিক শুধুমাত্র একটি কথা বললো–তোমরা........শীঘ্র........চলে যাও........মাথাটা কাৎ হয়ে পড়লো তার।

আশা ডুকরে কেঁদে উঠলো।

বনহুর বললো–আশা কেঁদে কোনো ফল হবে না জীবন দিয়ে আমাদের সে বাঁচিয়ে গেলো......

কিন্তু আমরা ফিরে গিয়ে তার বৃদ্ধা স্ত্রীকে কি জবাব দেবো? কি বলবো আমি তাকে....

বনহুর ওর হাত ধরে বললো–ওঠো আশা, এখানে বিলম্ব করা আর এক মুহূর্ত ঠিক হবে না। আবার হয়তো হামাগারে প্রবেশ করতে হবে।

আশা উঠে দাঁড়ালো।

বনহুর দ্রুতহস্তে ফলগুলো তুলে নিলো পকেটে তার সঙ্গে তুলে নিলো সেই সুন্দর গোলাকৃত পাথরের ছোট্ট নুড়িটা।

বৃদ্ধ শ্রমিকের মৃতদেহ পড়ে রইলো পেছনে।

বনহুর আর আশা ছুটতে শুরু করলো।

গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। শত্রু নিশ্চয়ই জানতে পেরেছে বন্দী হীমাগার থেকে পালিয়েছে। তাই তারা সন্ধান করতে

বেরিয়েছে। বৃদ্ধ শ্রমিকটিকে তারাই গুলীবিদ্ধ করে হত্যা করেছে।

একটা ঝোঁপের আড়ালে বসে পড়ে হাপাতে থাকে বনহুর আর আশা।

এতো জোরে ছুটছে ওরা যে জন্য অল্প সময়ে ঐ স্থান হতে বেশ দূরে আসতে সক্ষম হয়েছে।

বনহুর বললো–আশা, এমনি করে বার বার তুমি আমাকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছে। তোমার কাছে আমি চিরঋণীই শুধু নই, চিরকৃতজ্ঞ। বলল আশা তুমি কি চাও? আজ আমার মন বলছে তুমি যা চাইবে তাই দেবো তোমাকে।

এই মুহূর্তে আর আমার কিছু চাওয়ার নেই। বনহুর, তোমার ভালবাসা পাবার জন্য একদিন আমি উম্মাদিনী ছিলাম কিন্তু সে বাসনা আমার পূর্ণ হয়েছে।

আশা!

হাঁ বনহুর।

আশা, তোমাকে আমি আজও বুঝতে পারলাম না।

কোনো দিন পারবেনা বনহুর। একটু থেমে বললো আশা সত্যি তুমি অদ্ভুত এক পুরুষ যার সঙ্গে একালের কোনো পুরুষের তুলনা হয় না।

আশা! তুমি, তুমি আমাকে এতো বিশ্বাস করো?

আমি মনে প্রাণে তোমাকে শ্রদ্ধা করি, তাই……

কিন্তু আমি তোমার সেই শ্রদ্ধার বিনিময়ে শুধু তোমাকে ব্যথাই দিয়েছি। আশা আমি অপরাধী তোমার কাছে……

এ অপরাধ তোমার ইচ্ছাকৃত নয় আমি জানি। আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি বনহুর। তোমার কাছে আর আমার কিছুই চাওয়ার নেই। কথার মোড় ফেরাবার জন্য বললো আশা–বনহুর, এখানে আর বিলম্ব করা মোটেই উচিত হবে না। কারণ ওরা এদিকে আসতে পারে। চলো আমরা বন পেরিয়ে ওদিকে যাই।

তাই চলো আশা। কিন্তু বড় আফসোস, আমাদের সঙ্গে ওই বৃদ্ধ শ্রমিকটি আর ফিরে যাবে না।

হাঁ বনহুর, বড়ই দুঃখজনক, আমাদের উপকার করতে এসে বেচারা নিজের জীবন দিলো!

বনহুর আর আশা ফিরে চললো, গভীর বনের ভিতর দিয়ে অতিকষ্টে অগ্রসর হতে লাগলো ওরা।

মাঝে মাঝে হিংস্র জীবজন্তুর সামনে পড়ছিলো তারা। বনহুর বন্দী হবার পর তার সব অস্ত্র–ক্ষুদে রিভলভার, ঘড়ি আকারে ক্ষুদে ওয়্যারলেস এবং তার পকেটে থাকতো সব সময় স্কট বা রশি যা দিয়ে বনহুর সুউচ্চ প্রাচীর টপকাতো। সব ওরা নিয়ে নিয়েছিলো তার কাছ হতে। বনহুর হীমাগার থেকে মুক্তি পেয়েছে বটে কিন্তু তার সঙ্গের কোনো জিনিসপত্র কিছু নেই। বনহুর সম্পূর্ণ অস্ত্রহীন।

গভীর জঙ্গলে অস্ত্রহীন অবস্থায় বনহুর, কিন্তু আশার নিকটে ছিলো ক্ষুদে রিভলভার যা এই মুহূর্তে কাজে লাগলো। রিভলভারখানা আশা বনহুরকে দিয়ে বললো–এটা তুমি রাখো।

আবার তারা চলতে লাগলো।. .

এত বিপদেও আশার মুখে ক্লান্তির ছাপ নেই। একটা আনন্দ উজ্জ্বল দীপ্ত ভাব ফুটে উঠেছে তার দুচোখে। দীর্ঘ দিন এমন করে সে বনহুরকে পাশে পায়নি। ও ভাবছে এ পথ যদি কোনোদিন শেষ না হতো, এমনি করে সে আর ও যদি চলতে পারতো অনন্তকাল ধরে।

আশার শরীরে পুরুষের পোশাক। মাথার চুলগুলো কালো রুমালে বাধা। পুরুষ বলেই তাকে মনে করবে সবাই।

বনহুর এ পোশাকে আশাকে বহুবার দেখেছে। তাই প্রথম নজরেই তাকে চিনতে পেরেছে। এত বিপদেও তার মুখে হাসি ফুটেছিলো–সে হাসি আনন্দের।

আশাও বনহুরের মুখোভাব লক্ষ করে বুঝতে পারে। বনহুর তাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে অন্তর দিয়ে। তার সে ভালবাসায় নেই কৃত্রি এমতা কিন্তু সে তাকে

অপবিত্রতার ছোঁয়ায় কলুষিত করতে চায় না। নির্মল নিষ্পাপ সে ভালবাসা শিশিরস্নাত পুষ্পের মত।

চলতে চলতে বলে বনহুর–কি ভাবছো আশা?

তোমাকে হামাগার থেকে ফিরিয়ে আনতে পেরে কত যে আনন্দ লাগছে তা তোমাকে বোঝাতে পারবো না বনহুর।

আমি জানি আশা। তোমার চোখ দুটোই আমাকে সব বলে দিয়েছে। আশা, হুমায়রা ভাল আছে?

আশার চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো।

সে কিছু লুকাতে চেষ্টা করলো যেন।

বনহুর তার মুখোভাব লক্ষ করে বুঝতে পারলো আশা হুমায়রার কথাটা শোনার পর কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়লো।

ভ্রুকুঞ্চিত করে বললো বনহুর–হুমায়রার কি কোনো ক্ষতি হয়েছে যা তুমি বলতে চাওনা আমার কাছে?

বনহুর, তোমার সেই গচ্ছিত ধন আমি সযত্নে আগলে রেখেছিলাম কিন্তু……

বলো থামলে কেন আশা

হুমায়রা জাভেদের জন্য মানে তার ইন্দ্রনাথের জন্য একেবারে উন্মাদিনী হয়ে পড়লো, তখন তাকে নিয়ে আমি তোমার আস্তানায় গেলাম। ফুল্লরা আর জাভেদ একত্রে বসে কিছু করছিলো। এমন সময় আমি হুমায়রাকে নিয়ে উপস্থিত হলাম সেখানে।

তারপর?

হুমায়রা তার ইন্দ্রকে ফুল্লরার সান্নিধ্যে দেখতে পেয়ে মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলো, তারপর ছুটে গেলো বনের ভিতরে। আমরা তার অনেক সন্ধান করেও আর তাকে খুঁজে পেলাম না।

বলো কি।

হাঁ বনহুর, তাকে আর আমরা খুঁজে পাইনি।

তুমি নিজে সন্ধান করেছিলে তার?

করেছিলাম কিন্তু আশ্চর্য তার কোনো হদিস পাইনি। জানি না সে কোথায় এমনভাবে অন্তর্ধান

আশা, মেয়েরা বড় অভিমানী হয়। একটু বুঝতে ভুল করলে তাই নিয়ে অনেক বড় ঘটনা ঘটিয়ে বসে। তখন তাদের ভাববার বা চিন্তা করবার অবকাশ থাকে না। সামান্য ব্যাপার তখন হয়ে ওঠে ভীষণ আর ভয়ংকর।

সত্যি কি তাই?

আশা, আমি দেখেছি, তুমিই তার ব্যতিক্রম।

বনহুর।

হাঁ, তোমার মধ্যে আমি কোনোদিন এতটুকু অভিমান বা রাগ দেখিনি। সীমাহীন ক্ষমা তোমাকে করেছে আরও সুন্দর। আশা, তুমি পবিত্র এক দেবী।

বনহুর, তোমার মুখে এ কথা শুনবো কোনোদিন ভাবিনি। তুমি আমাকে এমন এক আসনে প্রতিষ্ঠিত করলে যার কোনো তুলনা হয় না।

বনহুর আর আশা পথ চলছিলো আর কথা বলছিলো।

একসময় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে।

বন আর বন। চলতে চলতে তারা এমন জায়গায় এসে পড়ে যেখানে বন আরও ঘন বলে মনে হচ্ছে। চারদিকে জমাট অন্ধকার। বনহুর বললো–আর এগুনো ঠিক হবে না আশা।

বলো?

এখানেই আমাদের রাত কাটাতে হবে।

আশা চারদিকে তাকিয়ে বললো–কিছু নজরে পড়ছে না।

হাঁ, কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমরা। ঘন বন হলেও দিনের আলোতে কিছুটা দেখা যাচ্ছিলো এখন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

বনহুর বললো–সঙ্গে আগুন জ্বালার কোনো বস্তু থাকলে আগুন জ্বেলে রাত কাটানো যেতো কিন্তু কোনো উপায় নেই। আশা, এ রাত আর ভোর হবে কিনা……

আমার মনেও এমনি একটা আশঙ্কা জাগছিলো। চারদিকে হিংস্র জীবজন্তুর আনাগোনা। জমাট অন্ধকার, কিছু নজরে পড়ছে না। এমন কি বনহুর তার অতি কাছে দাঁড়িয়ে আছে তবুও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

বনহুর বললো–আশা ভয় পাবার কিছু নেই। এখনও আমার হাতে তোমার দেয়া আগ্নেয়াস্ত্রটি আছে…..

তার চেয়ে বড় সাহস, তুমি আছো।

আশা, একটার পর একটা বিপদ যার জীবনের সাথী তাকে তুমি ভরসা করছো?

হাঁ, তোমাকে পাশে পেয়ে আমার শুধু সাহসই হয়নি, আমি গর্বিত, তুমি আছো আমার পাশে।

তাহলে এসো আমরা পাশাপাশি বসে রাত কাটিয়ে দেই।

আশা বনহুরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো।

বনহুর ওর হাত ধরে নিজের পাশে বসিয়ে দিয়ে বললো–যা ভাগ্যে থাকে ঘটবে। আশা, আমাকে উদ্ধার করতে এসে তুমি এমন কঠিন বিপদের সম্মুখীন হলে।

তুমি কি আমাকে আজও বুঝতে পারলে না বনহুর। তুমি মনে করো আমি নারী, মোমের পুতুলের মত একটুতেই মুষড়ে পড়বো……

অন্ধকারে বনহুর হেসে উঠলো–যে নারী হীমাগার থেকে দস্যু বনহুরকে উদ্ধার করে আনতে পারে তাকে আমি মোমের পুতুল মনে করতে পারি, এমন কথা তুমি

ভাবতে পারলে আশা? তুমি দস্যু সম্রাজ্ঞী……দুঃসাহসিনী বীরাঙ্গনা…….

চুপ, ঐ দেখো বনহুর, ওখানে দুটো চোখ আলোর বলের মত জ্বলছে। কোনো হিংস্র জন্তু হবে।

বনহুর বললো–তাই তো। তবে কি কোনো হিংস্র জানোয়ার আমাদের দিকে ওৎ পেতে আছে?

তাই মনে হচ্ছে।

বনহুর মুহূর্তে আশার দেয়া রিভলভারটা বের করে নিলো, তারপর সেই জ্বলজ্বলে আলোর বল লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লো।

আশ্চর্য নিশানা বনহুরের।

রিভলভার থেকে গুলী বের হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা গর্জন শোনা গেলো। কোনো হিংস্র জন্তুর আর্তহুঙ্কার।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো ওরা ঐ সময়ের জন্য।

বললো আশা–হা ভেবেছিলাম তাই। কোনো হিংস্র জীব আমাদের ওপর লাফিয়ে পড়বার জন্য ওৎ পেতে ছিলো, হয়তো আর এক মুহূর্ত, তাহলেই সে আমাদের ওপর লাফিয়ে পড়তো এবং হত্যা করতে আমাদের দুজনকে। ভাগ্যিস দেখে ফেলেছিলো নইলে মৃত্যু অনিবার্য ছিলো……

হাঁ আশা, সত্যি বলেছে। বনহুর কথাটা বলে রিভলভারটা পাশে রাখলো।

রাত ক্রমেই গম্ভীর হয়ে আসছে।

আশা আর বনহুর অন্ধকারে পাশাপাশি বসে আছে। বনহুরের নিঃশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে আশা।

উভয়েই ক্লান্ত ছিলো তাই দুজনাই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো এক সময়।

*

কখন যে রাত ভোর হয়ে এসেছে খেয়াল নেই কারও।

পাখির কিচির মিচির আওয়াজে চোখ মেললো আশা। বনহুর পাশে গাছটায় হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে। দক্ষিণ হাতে তার রিভলভারখানা ধরা আছে।

আশা তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ তারপর দৃষ্টি ফেরাতেই বিস্ময়ে চমকে উঠলো, একেবারে আশার পাশেই পড়ে আছে সেই বৃদ্ধ শ্রমিকটা। রক্তে জমাট বেঁধে আছে তার বুকের পাশের মাটি।

তার অদূরে একটি বাঘের মৃত দেহ পড়ে আছে।

আশা বুঝতে পারে বাঘটি বনহুরের গুলীতে নিহত হয়েছে। কিন্তু শ্রমিকটি এখানে এলো কি করে? আশা তাড়াতাড়ি বনহুরের গায়ে হাত রেখে ডাকলো–বনহুর, দেখো আমরা কোথায়?

চোখ মেলে বনহুর তাকাতেই চমকে সোজা হয়ে বসলো–আমরা ঠিক পূর্বস্থানে এসে হাজির হয়েছি আশা......

ঐ দেখো আমাদের পথ প্রদর্শক সেই শ্রমিক বৃদ্ধটির মৃতদেহ।

তাই তো। রাতের অন্ধকারে আমরা বুঝতে পারিনি। ঠিক আমরা সেই স্থানে এসে হাজির হয়েছি যে স্থানে তুমি আর আমি বসেছিলাম। শ্রমিক বৃদ্ধ আমাদের জন্য ফল সংগ্রহ করতে গিয়েছিলো, ফিরে এসেছিলো আহত অবস্থায় এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলো আমাদের সামনে।

হাঁ, ঐ যে তার লাশ পড়ে আছে এবং তুমি যে বাঘটিকে গুলী করে হত্যা করেছিলে সেই বাঘটি ঐ মৃতদেহ খাবার আশায় এখানে এসেছিলো। কিন্তু তার চোখ দুটো অন্ধকারে জ্বল জ্বল করে জ্বলছিলো বলেই তার মৃত্যু ঘটেছে তোমার গুলীতে।

আশ্চর্য আশা, আমরা পুনরায় সেই স্থানে এসে পড়েছি। যে স্থানে আমরা প্রথম বিশ্রাম করেছিলাম।

বৃদ্ধ শ্রমিকটির লাশ পড়ে আছে তেমনিভাবে, হাত দুখানা তার প্রসারিত হয়ে আছে সামনে।

আশার চোখ দুটো ছল ছল করে উঠলো। বললো সে–ওর জন্যই তোমাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি বনহুর।

আশা, আমার জন্য সে নিজের জীবন দান করে গেলো। মহামানব সে...বাষ্প রুদ্ধ হয়ে এলো তার কণ্ঠস্বর।

বনহুর আর আশা মিলে অনেকগুলো ডালপালা নিয়ে ঢেকে দিলো শ্রমিক বৃদ্ধের লাশটা। তারপর হাতের পিঠে চোখের পানি মুছে দুজন বিদায় গ্রহণ করলো সেখান থেকে। যাবার সময় আবার তারা তাকিয়ে দেখলো বৃদ্ধের লাশটার দিকে।

হিংস্র বাঘটার দিকেও তারা দেখলো, যদি তাদের কাছে ঐ রিভলভারখানা না থাকতো তা হলে রাতের অন্ধকারে মৃত্যু তাদের অনিবার্য ছিলো। আল্লাহর নিকটে ওরা শুকরিয়া আদায় করে প্রাণ ভরে।

আবার শুরু হলো চলা।

হঠাৎ পকেটে ফলের সন্ধানে হাত দিতেই সেই পাথরখানা স্পর্শ করে। বনহুর পাথরটা বের করে চোখের সামনে তুলে ধরে। আশ্চর্য পাথরখানা, সুন্দর গোলাকার।

আশা বলে–ওটা বড় উজ্জ্বল লাগছে। ওর দেহটাও বড় মসৃণ। না জানি কত পাহাড় পর্বত আর নদীনালা গড়িয়ে গড়িয়ে শেষে ও তোমার পকেটে স্থান করে নিয়েছে।

একটু হেসে বললো–এটা তোমার উপহার আশা। ওটা যতক্ষণ আমার কাছে থাকবে তোমার দেয়া উপহার মনে করবো।

আশার চোখ দুটো অশ্রুসজল হলো।

বনহুর তাকে কত ভালবাসে তার প্রমাণ তার মনের কথা, আত্মতৃপ্তিতে ভরে ওঠে আশার মন।

পথ যেন শেষ হয় না।

বনহুর বলে–কোন মুহূর্তে নরপশুরা আবার আমাদের ওপর হামলা চালাবে কে জানে। চলো আমরা বিপরীত দিকে চলতে থাকি।

চলো।

বনহুর আর আশা পথ চলছে।

বন থেকে সুপক্ক সুস্বাদু ফল খেয়েছে ওরা। তাই ক্ষুধা-পিপাসা তাদের ছিলো না।

অনেক পথ অতিক্রম করার পর তারা এক নদীর তীরে এসে পৌঁছলো। নদীটি খরস্রোতা, প্রবল বেগ্নে নদীর জলধারা একদিকে বয়ে চলেছে। বনহুর আর আশা নদীতীরে এসে দাঁড়ালো। এখন তারা অনেকটা নিশ্চিন্ত বলা যায়।

হীমাগার থেকে বহুদূরে চলে এসেছে।

বনহুর বললো–নদীর জলরাশি সচ্ছ। এসো আশা, প্রাণভরে পানি পান করি। কিন্তু সাবধান, একটু পা হড়কে গেলে আর রক্ষা নেই।

আশা আর বনহুর নদীর ধারে এসে পানি পান করলো। অত্যন্ত সাবধানে ছিলো ওরা, কারণ পা পিছলে পড়ে গেলে প্রবল স্রোতের টানে ভেসে যেতে, ধরে রাখার ক্ষমতা ছিলো না কারও।

বনহুর আর আশা কতদিন পর তৃপ্তি সহকারে সচ্ছ পানি পান করলো।

আশা বললো–নবজীবন লাভ করলাম।

তুমি নয়, আমি! মৃত্যুর বিভীষিকা আমাকে গ্রাস করতো কিন্তু……

বনহুরের কথা শেষ হয় না, কয়েকজন সশস্ত্র লোক তাকে ঘিরে ধরলো আচমকা।

বনহুর আর আশা বিস্ময় নিয়ে তাকালো সেই লোকগুলোর দিকে।

ওদের মধ্য হতে একজন বলে উঠলো–এই ব্যক্তিই দস্যু বনহুর। হীমাগার থেকে উধাও হয়েছে……

অপর জন বললো– স্যার, এই ব্যক্তিই দস্যু বনহুর।

গ্রেপ্তার করে ফেলে। নির্দেশ দিলো দলপতি।

বনহুর দেখে নিলো কজন ওরা এবং কি পজিশনে দাঁড়িয়ে আছে।

আশা আর বনহুর বেশ বুঝতে পেরেছে হীমাগার হতে চলে আসার পর হীমাগারের প্রহরীরা বন্দীর সন্ধান করে ফিরছিলো এবং তারা দূরবীক্ষণ চোখে চারদিকে লক্ষ করছিলো।

একজনের হাতে তারা দূরবীক্ষণ যন্ত্র দেখতে পেলো।

প্রায় সবার হাতে অস্ত্র রয়েছে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে তার ক্ষুদে রিভলভারখানা বের করে চেপে ধরলো দলপতির বুকে, বললো–খবরদার, তোমরা কেউ নড়লে আমি তোমাদের দলপতিকে গুলী করবো।

ওরা কেউ ভাবতে পারেনি ওর কাছে কোনো অস্ত্র আছে। তাই ওরা সবাই বনহুরকে ও তার সাথীকে লক্ষ করছিলো যেন তারা পালাতে না পারে।

হঠাৎ বনহুর এভাবে দলপতিকে ধরে ফেলবে তারা অনুমান করতে পারেনি।

তারা যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। ওরা জানে বনহুর কত ভয়ংকর এবং দুঃসাহসী, তাই চট করে তার কাছাকাছি এগুতে সাহস পায় না। দলপতি নিহত হলে তাদের কোনো উপায় থাকবে না। সবাইকে বনহুর হত্যা করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর এমনভাবে দলপতিকে ধরেছিলো তার ক্ষমতা নেই একটু নড়ে। বনহুরের ক্ষুদে রিভলভারখানা তার পাঁজরে চেপে রয়েছে।

গম্ভীর কঠিন কণ্ঠে বললো বনহুর–সবাই নদীতে অস্ত্র নিক্ষেপ করো।

শক্তিশালী অস্ত্রধারী প্রহরীরা নিরুপায় হয়ে পড়েছে। এমন কৌশলে বনহুর দলপতিকে আয়ত্তে এনেছে যে কারও করবার কিছু ছিলো না।

আশা বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, সে দলপতির হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নেয় এবং সেও বাগিয়ে ধরে সবাইকে লক্ষ্য করে।

বনহুর পুনরায় দাতে দাঁত পিষে বলে–শীঘ্র অস্ত্র নদীতে নিক্ষেপ করো নইলে.....দলপতির বক্ষ ভেদ করে চলে যাবে গুলী। নিক্ষেপ করো অস্ত্র,

এবার বনহুরের নির্দেশ পালন না করে পারলো না তারা। কারণ তাদের দলপতির ভাগ্য নির্ভর করছে তাদের অস্ত্র নিক্ষেপ করার ওপর।

সবাই নিজ নিজ অস্ত্র নদী বক্ষে নিক্ষেপ করতে বাধ্য হলো।

এবার বনহুর সরিয়ে নিলো তার ক্ষুদে রিভলভারখানা দলপতির পাঁজর থেকে।

যেমনি দলপতির পাজর থেকে রিভলভারখানা বনহুর সরিয়ে নিয়েছে অমনি সবাই বনহুর আর আশাকে আক্রমণ করে বসলো।

শুরু হলো মল্লযুদ্ধ।

অস্ত্রহীনদের প্রতি অস্ত্র ব্যবহার করা মোটেই সমীচীন মনে করতো না বনহুর। তাই বনহুর তার রিভলভারখানা প্যান্টের পকেটে রেখে লড়াই শুরু করলো।

আশা তার অস্ত্র বাগিয়ে ধরেছিলো, বনহুর তাকে বারণ করলো, গুলী নিক্ষেপ করো না আশা। বনহুরের নির্দেশমত আশা অস্ত্র হাতে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে পড়েছিলো। তবে সে অস্ত্র উদ্যত রেখেছিলো কেউ তাকে আক্রমণ করলে সে তাকে ক্ষমা করবে না।

প্রহরীরা বনহুরকে চিনতে পেরেছিলো তাই তারা আশার ওপরে হামলা না চালিয়ে সবাই আক্রমণ চালিয়েছিলো তার ওপর।

কিন্তু ওরা জানতো না বনহুর একা হলেও তাদের দশজনের শক্তি ধারণ করে।

বনহুরকে যখন ওরা প্রচন্ডভাবে আক্রমণ করে বসলো তখন বনহুর এক একজনকে শূন্যে তুলে নিয়ে নদীবক্ষে নিক্ষেপ করতে লাগলো।

সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের জন্য একবার ক্ষীণ একটা আর্তনাদ ভেসে আসতো কানে তারপর ভীষণ স্রোতের টানে কোথায় তলিয়ে যাচ্ছিলো তার কোনো হদিস পাওয়া

যাচ্ছিলো না।

তিন-চারজনকে নদীবক্ষে নিক্ষেপ করতেই অন্যরা ভীত হয়ে পড়লো। তারা ভাবতে পারেনি বনহুরের শরীরে এত শক্তি। সঙ্গীদের নির্মম পরিণতি লক্ষ্য করে সবাই দে ছুট। যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো।

এমন কি দলপতিও পালাতে বাধ্য হলো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।

সবাই যখন সরে পড়লো আশা হেসে বললো–বনহুর, জানতাম তুমি জয়ী হবে। যাক, আরও একটি অস্ত্র আমাদের হাতে এসে গেলো।

বললো বনহুর–এখানে আর বিলম্ব করা উচিত হবে না। চলো আশা। জানি না কোন দিকে কোন্ বিপদ ওৎ পেতে আছে।

আশা বললো–আমাদের ফিরে যাবার একমাত্র পথ জাহাজে আরাকান বন্দরে পৌঁছানো। সেখানে সেই বৃদ্ধের স্ত্রী প্রতীক্ষা করছে......গলা ধরে আসে আশার। একটু থেমে বলে আশা–আমার অশ্বটিকেও তার হেফাযতে রেখে এসেছি।

বনহুর বললো–তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না আশা।

বেশি বাহবা দরকার নেই বনহু। চলো কোনদিকে যাবো।

বনহুর বললো–আমার পকেটে পাথরের নুড়িটা আছে, ওটা মাটিতে ফেলবো, যেদিকে ওটা বেশি গড়িয়ে যাবে আমরা সেই দিকে চলতে শুরু করবো।

তুমি এখনও ছেলেমানুষি করেছ বনহুর।

না, এটা আমার মনের কথা।

বেশ, তাই করো।

বনহুর বালির মধ্যে আংগুল দিয়ে একটি গোলাকার রেখা টানলো। তারপর ঠিক গোলাকার রেখার মধ্যে পাথরের নুড়িটা কিছু উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

এবার বনহুর একটি কাঠি হাতে নিয়ে মাপ দিয়ে হেসে বললো–পূর্বদিকে যাওয়ার জন্য ইংগিত দিয়েছে আমার সঙ্গীটি।

নুড়িটা তোমার সঙ্গী আর আমি

হাসলো বনহুর।

তারপর ওরা নুড়ির নির্দেশমত পূর্বদিকে চলতে শুরু করলো।

বহুক্ষণ চলার পর তারা দূরে বহুদূরে একটি ধূম্রকুন্ডলি দেখতে পেলো।

বনহুর বললো–আশা আমরা কোনো বন্দরের কাছাকাছি এসে পড়েছি।

আশা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো, বললো তোমার কথা যেন সত্য হয়।

তাই হলো, আরও কিছু চলার পর তারা যা ভেবেছিলো তাই দেখলো। একটি বন্দরে এসে উপস্থিত হলো বনহুর আর আশা। উভয়ের চেহারায় ক্লান্তি আর অবসন্নতার ছাপ বিদ্যমান। এলোমেলো রুক্ষ চুল, বনহুরের মুখে একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরিধেয় বস্ত্র মলিন জীর্ণশীর্ণ।

আশা বললো–এ অবস্থায় জাহাজে স্থান পাওয়া মুস্কিল হবে। তাছাড়া লোকজন সন্দেহ করে বসবে। হিন্দোল হীমাগারের প্রহরীদের নজরেও আমরা পড়ে যেতে পারি।

হাঁ, এ কথা সত্য।

আমার কাছে বেশ কিছু অর্থ আছে। চলো বনহুর আমরা কোনো হোটেলে আশ্রয় নেই, তারপর কয়েকদিন সেখানে থাকার পর যখন আমাদের..

ঠিক আছে তোমার কথাই আমি মেনে নিলাম। বনহুর আর আশা মিলে নিকটস্থ এক হোটেলে আশ্রয় নিলো।

বনহুর ও আশা দুজন বন্ধু বলে পরিচয় দিলো হোটেলে কিন্তু দুজন দুটি কামরা ভাড়া করেছিলো তারা।

বনহুর আর আশা নিজ নিজ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নিয়েছিলো বন্দর সংলগ্ন এক দোকান থেকে।

এরপর তারা যখন নিজ নিজ কামরা থেকে বের হলো তখন তারা আর পূর্বের সেই ব্যক্তি নেই। তারা সুন্দর সুষ্ঠু স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে লোকসমাজে স্থান করে নিতে পারবে।

প্রথম তো হোটেলের মালিক বনহুর আর আশাকে তার হোটেলে স্থানই দিচ্ছিলো না। দূর দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছিলো, কারণ তাদের দেহের যে পোশাক ছিলো তা জীর্ণশীর্ণ আর ময়লা ছিলো। চুল রুক্ষ, পায়ে এক হাঁটু ধুলো কাদা।

এমন লোক কি করে একটা ভাল হোটেলে স্থান পাবে। প্রতিদিন যে ভাড়া তা কি তারা দিতে পারবে? হোটেলের মালিক যখন তাদের বিদ্রূপ করে বলেছিলো, ঠাট্টা করার জায়গা পাওনি। যাও, পথে তোমাদের জন্য অনেক জায়গা আছে। তখন বনহুর ভেবেছিলো এক ঘুষিতে ওর দাঁত ফেলে দেয়। কিন্তু আশা বনহুরের মুখোভাব লক্ষ্য করে বলেছিলো–রাজা, তোমাকে উনি চিনতে পারেননি। জাহাজডুবিতে তুমি সব হারিয়েছে তা জানেন না। জানলে এমন কথা বলতেন না।

হোটেল মালিক অবাক হয়েছিলো, দুচোখে বিস্ময় নিয়ে বলেছিলো–রাজা! বলল কি তোমরা?

আশা জবাব দিয়েছিলো–জাহাজডুবি আমাদের এ অবস্থা করেছে। আমরা অনেক বিপদ পেরিয়ে আপনার হোটেলে এসেছি। তবে মনে করবেন না আমরা আপনার হোটেল ভাড়া দিতে পারবো না। এই নিন……পকেট থেকে একটা মোহর বের করে হোটেল মালিকের সামনে

দু চোখ কপালে উঠলো হোটেল মালিকের।

ভিখারীর নিকটে স্বর্ণমোহর, সত্যি কোনো দেশের রাজাই হবে।

ছোটল মালিক বিনীত কণ্ঠে বললো–মাফ করে দিন আমাকে। আমি আপনাদের চিনতে না। পেরে পথের মানুষ বলে তাড়িয়ে দিচ্ছিলাম।

এবার বনহুর কথা বললো–স্বর্ণ মোহর দেখতে পেয়ে তোমার চোখে রংধনু খেলা করছে। আর পথের মানুষ হলে তাদের কোনো স্থান নেই তোমার হোটেলে।

মাফ করে দিন হুজুর।

যাও, এবার মাফ করলাম। এরপর আরও বহুবার আমি আসবো ভিখারীর ছদ্মবেশে, দেখবো সত্যি তোমাদের মিথ্যা অহংকার ঠিক পূর্বের মতই আছে কি নেই।

আচ্ছা হুজুর, এরপর আর এমন হবে না। দু হাত জুড়ে বলেছিলো হোটেল মালিক।

বনহুর আর আশা দুজন দু কামরায় ইচ্ছামত নিজেদের পোশাক পরিচ্ছদ বদলিয়ে নিলো। তাদের দেখে কেউ এখন পথের মানুষ বলতে পারবে না। তবে আশা পুরুষের পোশাকই পরিধান করে নিয়েছিলো, কারণ তাকে যেন কেউ নারী বলে চিনতে না পারে।

গলার স্বর অবশ্যই পরিবর্তন করার উপায় ছিলো না, তাই কণ্ঠস্বর নারীর মতই ছিলো। অনেক সময় দেখা যায় অনেক পুরুষের কণ্ঠস্বর মেয়েদের মত। তাই কেউ তেমন সন্দেহ করলো না।

আশা বনহুরের পরিচয় আরাকানের রাজকুমার বলেই দিয়েছিলো হোটেল মালিকের কাছে এবং বলে দিয়েছিলো সে যেন কারো কাছে তার পরিচয় না জানায়। যাবার সময় তাকে খুশি করে যাবেন তিনি।

প্রথমেই হাতে একটি মোহর পেয়ে হোটেল মালিক খুব খুশি হয়েছিলো। আরও পাওয়ার লোভে অত্যন্ত আদর যত্ন করতে লাগলো।

কিন্তু অবাক হলো হোটেল মালিক, দু বন্ধু দুই কামরায় রাত্রি যাপন করে। হয়তো বা রাজকুমার বলেই তার সঙ্গী তাকে সমীহ করে চলে, তাই তাদের মধ্যে এতো ব্যবধান।

দু দিন কাটানোর পর হোটেল থেকে বিদায় গ্রহণ করলো ওরা।

হোটেল মালিকের সংগে বেশ খাতির জমে উঠেছিলো আশার। অবশ্য বনহুরকে রাজকুমার ভেবেই হোটেল মালিক তার সান্নিধ্যে যেতো না। লজ্জা বোধও ছিলো তার। প্রথম দিন যে আচরণ সে ওদের সঙ্গে করেছিলো তার পর থেকে হোটেল মালিক হোটেলের অন্যান্য কর্মচারীর ওপর নির্দেশ দিয়েছিলো অতিথিদ্বয়ের যেন কোনো অসুবিধা না হয়। তারা যেন সদাসর্বদা হাজির থেকে আদেশ পালন করে।

বিদায়কালে হোটেল মালিককে তার পাওয়া ছাড়াই কয়েকটা মোহর উপহার দিলো আশা। এমন কি হোটেলের বয় যারা সর্বক্ষণ তাদের আদেশ পালনে নিয়োজিত ছিলো তাদের হাতেও একটি করে মোহর দিলো সে।

তারপর বিদায় মুহূর্তে হোটেল মালিক অশ্রুসজল নয়নে বিদায় জানালো এবং কথা দিলো আর কোনোদিন সে কারও সঙ্গে অসৎ আচরণ করবেন না। পথের মানুষ বলে কাউকে অবহেলা দেখাবেন না।

জাহাজের ক্যাবিনে বসে তাকালো বনহুর আশার মুখের দিকে।

আশা ক্যাবিনের শার্শী দিয়ে তাকিয়ে ছিলো দূরে বহুদূরে ছেড়ে আশা বন্দরটির দিকে।

একটু হেসে বললো বনহুর–আশা, সত্যি তুমি অদ্বিতীয়া নারী।

ফিরে তাকালো আশা।

সরে এলো বনহুরের পাশে।

বললো–কেমন করে?

তোমার বুদ্ধির কাছে আমি পরাজিত। তোমার সুকৌশল বুদ্ধিমত্তার জন্যই আমি আজ ফিরে যেতে সক্ষম হচ্ছি আশা।

এ আমার পরম সৌভাগ্য। বললো আশা।

দিনের পর দিন তুমি আমাকে ঋণীই করে চলেছে। জানি না কোনো দিন তোমার এ ঋণ। আমি পরিশোধ করতে পারবো কিনা।

ছিঃ! অমন কথা বলোনা বনহুর। তোমাকে ভালবাসতে পেরেই আমি পুষ্পের মত পবিত্র হতে পেরেছি। তুমি আমাকে ধন্য করেছে বনহুর! একদিন আমিও দস্যুতা করেছি ছিনিয়ে নিয়েছি কত শত মানুষের সঞ্চিত ধনরত্ন জানমাল। প্রেম ভালবাসা মায়া মমতা বলে আমার কিছু ছিলো না। তারপর তোমাকে যেদিন দেখলাম সত্যি আমি নিজেকে হারিয়ে ফেললাম, প্রেম ভালবাসা সেদিন আমার মনে নতুন এক উৎস বয়ে আনলো....

আশা!

হা বনহুর।

তোমার প্রেম আমাকে বিমুগ্ধ করেছে আশা। তুমি বিস্ময়কর নারী।

তোমার মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছি এক অদ্ভুত মানুষের সন্ধান। যা আমি কল্পনার ছবিতে আঁকতাম তাই তুমি।

তুমি ভুল করেছিলো, যে ভুল তোমার জীবনকে এলোমেলো করে দিয়েছে।

তবু আমি ধন্য বনহুর। কথাটা বলে আশার মুখমন্ডল রাঙা হয়ে উঠলো, সে বেরিয়ে গেলো দ্রুত সেই ক্যাবিন থেকে।

রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলো আশা সমুদ্রের অথৈ জলরাশির দিকে। ভাবছে আশা তার অতীত জীবনের কথা। কত কথা আজ মনে পড়ছে একটির পর একটি করে। বনহুরের সঙ্গে অনেক স্মৃতি ভেসে ওঠে তার মানসপটে। ভাবতে থাকে আশা ঠিক ঐ মুহূর্তে কেউ যেন এসে পাশে দাঁড়ালো তার।

ফিরে তাকালো আশা।

বনহুর তার পাশে দাঁড়িয়ে বললো–কি দেখছো আশা?

দেখছিনা ভাবছি আমাদের জীবন কত বৈচিত্রময়–অনেক কিছু দেখলাম উপভোগ করলাম

বলো থামলে কেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো আশা–কিন্তু সত্যি কি আমরা সবাই সুখী?

হু, তোমার প্রশ্ন অত্যন্ত শক্ত আশা, কারণ এ পথিবীতে এমন কেউ নেই যে সর্ববিষয়ে সুখী। সবার মধ্যেই রয়েছে একটা না একটা কিছুর অভাব। যার অর্থ আছে তার আরও লোভ হয় কেমন করে আরও অর্থ সগ্রহ করা যায়। যার সম্পদ আছে সে মনে করে কেমন করে আরও ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়া যায়। যার মান–সম্মান আছে সে ভাবে কেমন করে আরও উচ্চ শিখরে উঠা যায়, আরও সম্মানের পাত্র হওয়া যায়। এমনি লোভ লালসা আর মোহের অন্ত নেই, আর সেই কারণেই কেউ এ পৃথিবীতে সর্বসুখী হতে পারে না। মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই, বুঝলে আশা?

কিন্তু যার কোনো লোভ–লালসা মোহ নেই? সে কি সর্ববিষয়ে সুখী?

না। তারও মধ্যে অভাব আছে।

কারণ?

লোভ–লালসা না থাকলেও তার হয়তো এমন কিছুর অভাব আছে যা না পেলে তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

এ কথা কি সত্যি?

হা সত্যি।

বনহুর, আমি জানি লোভ–লালসা মোহ কোনোটাই তোমার নেই। তবু তুমি কি সুখী নও?

বনহুর হেসে বললো–আমি তো বলেছি মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই।

তোমার আকাঙ্ক্ষা আছে? কিসের আকাঙ্ক্ষা? কি চাও তুমি? ধন–রত্ন মনি–মাণিক্য এমন কি প্রেম ভালবাসা তোমাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। পৃথিবীর কোনো বস্তু তোমার জীবনে প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তোমার আকাঙ্ক্ষা আছে কিছু কিছু চাও তুমি?

হা আমি চাই।

বলো তুমি কি চাও? আমার ভূগর্ভস্থ সমস্ত রত্নভান্ডার তোমাকে উজার করে দেবো।

বনহুর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

আশা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে। বড় অদ্ভুত বড় বিস্ময়কর লাগছে। ওকে। আশা নির্বাক হয়ে গেলো মুহূর্তের জন্য।

ঠিক ঐ মুহূর্তে একটা আর্তনাদ শোনা গেলো জাহাজের ওদিকে রেলিংটার পাশে।

বনহুর আর আশা ছুটে গেলো।

দেখলো এক ভদ্রলোক চিৎকার করে আর্তকণ্ঠে বলছেন

ঐ যে আমার ছেলের জামাটা দেখা গেলো। ওখানে আমার ছেলে পড়ে গেছে......হায় হায়, আর আমি ওকে ফিরে পাবো না।

ততক্ষণে আরও লোকজন জমে গেছে সেখানে।

বনহুর কিছু ভাববার অবকাশ পেলো না, সে মুহূর্তে বুঝে নিলো ঐ ভদ্রলোকের সন্তান সমুদ্র বক্ষে নিমজ্জিত হয়েছে। তাকে উদ্ধার করা কঠিন, কারণ জাহাজখানা তখন বেগে ছুটে চলেছে। বনহুর গায়ের জামাটা একটানে খুলে আমার দিকে ছুঁড়ে দিলো–তারপর কেউ কিছু বলবার পূর্বেই সে লাফিয়ে পড়লো সমুদ্রের বুকে।

আশা এবং বনহুর ছুটে এসে যখন ভদ্রলোকটির পাশে দাঁড়িয়েছিলো তখন ভদ্রলোক আংগুল দিয়ে সমুদ্রবক্ষের দিকে দেখিয়ে চিৎকার করছিলেন–ঐ যে আমার ছেলের জামাটা দেখা গেলো....

আশা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো, সে ভাবতেও পারেনি হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটে যাবে মুহূর্তে।

আশা ছুটলো ক্যাপ্টেনের কক্ষের দিকে।

তাড়াতাড়ি জাহাজখানার গতি মন্থর করার জন্য অনুরোধ জানালো আশা। ঘটনাটা সংক্ষেপে বললো সে।

ক্যাপ্টেন জাহাজের গতি মন্থর করে আনলো। তারপর একেবারে থামিয়ে দিলো জাহাজখানাকে মাঝসমুদ্রে। অন্যান্য নাবিক ক্যাপ্টেনের নির্দেশমত দ্রুত লাইফবয় এবং বোট নামিয়ে দিলো। কয়েকজন উদ্ধারকারী নেমে গেলো দড়ির সিঁড়ি বেয়ে সমুদ্রের পানিতে।

বনহুর অতিকষ্টে বালকটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হলো। বনহুর তাকে নিয়ে যখন ঢেউয়ের বুকে ভেসে উঠলো তখন লাইফবয়গুলো তার দিকে ঠেলে দেয়া হলো।

কয়েকজন উদ্ধারকারী বোট নিয়ে বনহুরের দিকে এগিয়ে গেলো।

বনহুর বালকটিকে ধরে সাঁতার কেটে বোটখানার দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। তার দেহটা একবার ডুবছে আবার ঢেউয়ের ওপর ভেসে উঠছে। বনহুর দক্ষ সাঁতারু বলেই সে এই উত্তাল ঢেউয়ের বুকে এখনও ভেসে আছে।

উদ্ধারকারী মোটর বোটখানা বনহুরের নিকটে পৌঁছতে সক্ষম হলো এক সময় এবং বনহুর আর বালকটিকে তুলে নিলো মোটরবোটখানার ওপরে।

বনহুর আর বালকটিকে যখন জাহাজে উঠানো হলো তখন জাহাজে একটা আনন্দ উৎসব বয়ে চললো।

বালকটির পিতা সংজ্ঞাহীন বালকটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ অশ্রু বিসর্জন করে চললেন বনহুরের হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বললেন তিনি–সত্যি, কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো ভেবে পাচ্ছি না। আমার একটিমাত্র সন্তান। ওর মা অসুস্থ তাই ওকে বিদেশ থেকে দেশে নিয়ে যাচ্ছি। মৃত্যুশয্যায় তিনি সন্তানকে দেখার জন্য প্রহর গুণছেন। আপনি যদি ওকে এই মহারাক্ষসী সমুদ্রের করাল গ্রাস হতে উদ্ধার করে না আনতেন তাহলে আমি কিছুতেই এমুখ আর স্ত্রীকে দেখাতাম না....বলে কাঁদতে লাগলেন ভদ্রলোক।

বনহুর সান্ত্বনা দিয়ে বললেন–আমি যে ওকে বিশাল সমুদ্রবক্ষ হতে তুলে আনতে সক্ষম হয়েছি এ জন্য আমি দয়াময়ের নিকটে হাজার শুকরিয়া করছি। আপনার স্ত্রী যেন সন্তানের মুখ দেখে রোগমুক্ত হন।

দোয়া করবেন আপনি। বললেন ভদ্রলোক, তারপর পকেট থেকে একগাদা নোট বের করে বাড়িয়ে ধরলেন–আমার এই সামান্য উপহার গ্রহণ করুন।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো–ওটা আপনার কাছে রেখে দিন, আমি তাতেই খুশি হবো বেশি।

বিস্ময়ভরা চোখে তাকালেন ভদ্রলোক বনহুরের মুখের দিকে, এতো টাকা তবু উনি গ্রহণ করলেন না। অদ্ভুত এ লোকটা।

শুধু ভদ্র লোকটাই নয় যারা ওখানে উপস্থিত ছিলো তারা সবাই অবাক না হয়ে পারলো না। এতো টাকা সে গ্রহণ করলো না এটা বড় বিস্ময়কর ব্যাপার, তবে অনেকেই জানে উপকার করে কেউ তার প্রতিদান গ্রহণ করে না বা করতে চায় না।

এই ঘটনার পর জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে সকলেই বনহুরকে এক নজর দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কে সেই মহান ব্যক্তি যিনি নিজের প্রাণ বিপন্ন করে একটি বালকের প্রাণ রক্ষা করলেন।

বালকটিও সব সময় বনহুরের কাছে আসে। একটা গভীর ভালবাসা গড়ে উঠলো বনহুর আর বালকটির মধ্যে।

আশাও ওকে আদর করে।

খাবার কিনে খেতে দেয়।

ভদ্রলোকটির আনন্দ আর ধরে না।

একদিন জাহাজখানা আরাকান বন্দরে পৌঁছে যায়।

আনন্দে উৎফুল্ল যাত্রীগণ।

কিন্তু আশার দু চোখে পানি টলমল করে। যতই বৃদ্ধের বাড়ির সন্নিকটে এসে পড়ে তারা ততই তাদের মধ্যে গভীর বেদনার ছাপ ফুটে ওঠে।

বনহুর বলে–আশা, আমাকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি এমন একটা ক্ষতি করলে যা অপূরণীয়।

জানি বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দেবার মত আমার ভাষা নেই কিন্তু আমি জানি বৃদ্ধা সব শুনলে আমাকে ক্ষমা না করে পারবে না।

তারপর তারা যখন সেই বৃদ্ধার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে এলো বৃদ্ধা, ঘোলাটে দুচোখে তার খুশির উচ্ছ্বাস। ব্যস্তসমস্ত কণ্ঠে বললো বৃদ্ধা–তোমরা ফিরে এসেছে বাবা? তোমাদের কাজ সম্পন্ন হয়েছে তো? আমি কিন্তু তোমাদের ঘোড়াটিকে খুব যত্ন করে রেখেছিলাম। একটুও কষ্ট পেতে দেই নি তাকে।

আশা অতিকষ্টে নিজকে সংযত রেখেছে, তার দুচোখ ছাপিয়ে অশ্রুধারা নেমে আসতে চাইছিলো কিন্তু আশা অনেক সাবধানে নিজেকে সামলে রেখে দাঁড়িয়ে ছিলো বোবার মত।

কথা বললো বনহুর–বুড়ী মা, আমি তোমার একটি ছেলে। আমাকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলো এরা। মানে এ আর তোমার স্বামী....

বুড়া কই? আমার বুড়াকে দেখছিনা কেন? এবার বৃদ্ধার দু চোখে সন্ধানী দৃষ্টি। ভাল করে তাকালো বৃদ্ধা চারপাশে। কই বুড়া কোথায়।

এবার আশা নিজকে সংযত রাখতে পারে না, বলে ওঠে সে–বুড়ীমা, তোমার স্বামী তোমার হীরার কাছে চলে গেছে।

বলিস কি তোরা।

হা বুড়ীমা।

বৃদ্ধা এবার আশার হাত দু খানা এঁটে ধরে ভীষণভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে–বুড়াকে তোরা কোথায় রেখে এলি বল বল বুড়া কোথায়?

বনহুর বদ্ধাকে ধরে বললো–বুড়ীমা, আমি তোমার ছেলে। তোমার স্বামী আমাকে উদ্ধার করতে গিয়ে মারা পড়েছে। আমি তোমার ছেলে.......

না, তুই আমার ছেলে না। তোরা আমার বুড়াকে মেরে ফেলেছিস।

বুড়ীমা, বিশ্বাস করো আমাদের কোনো দোষ নেই। বুড়া বাবা আমাদের না জানিয়ে ফল আনতে গিয়েছিলো তখন তাকে শত্রু গুলিবিদ্ধ করেছিলো...... সমস্ত ঘটনাটা বনহুর সংক্ষেপে বলে। বৃদ্ধার কাছে।

তারপর এক সময় বৃদ্ধা শান্ত হয়ে আসে।

বনহুর আর আশা শপথ করে যতদিন বৃদ্ধা বেঁচে থাকবে ততদিন তারা নিজ সন্তানের মতই দেখাশোনা করবে। যখনই সময় পাবে তখনই তারা আসবে এই আরাকান শহরে।

এক সময় বৃদ্ধা তাদের বিদায় জানায়।

আশার অশ্বপৃষ্ঠে বনহুর আর আশা উভয়ে চেপে বসে। যাবার সময় বেশ কয়েকটা মোহর দিয়ে যায় আশা বৃদ্ধার হাতে।

*

আশাকে তার আবাসস্থলে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসে বনহুর আস্তানায়।

আশার মুখে যখন জানতে পেরেছিলো হুমায়রা চলে গেছে, কোথায় গেছে কেউ জানে না, অনেক সন্ধান করেও তাকে পাওয়া যায় নি। তখন বনহুরের মনে গভীর একটা দুশ্চিন্তার ছায়া রেখাপাত করেছিলো। তবে কি সে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু তার মৃতদেহ তো পাওয়া যায়নি।

কথাগুলো ভাবছিলো বনহুর, সত্যি সে হুমায়রাকে স্নেহ করতে ভালবাসতো কারণ হুমায়রা বড় অসহায় মেয়ে। আপন বলতে কেউ তার ছিলো না। আর সে কারণেই তার একটা করুণা ছিলো হুমায়রার প্রতি।

এ পাশ ওপাশ করছে বনহুর।

চোখে তার ঘুম আসছে না।

আশার দেওয়া সেই পাথরটা শিয়রে টেবিলের ওপরে যত্ন সহকারে রেখে দিয়েছিলো নূরী।

বনহুর হীমাগার কারাকক্ষ থেকে ফিরে এসে আশার দেয়া সেই সুন্দর পাথরটা উপহার স্বরূপ দান করেছিলো নূরীকে।

নূরী সেটা যত্ন করে রেখে দিয়েছিলো শয্যার শিয়রে টেবিলটার ওপরে। পাথরটার প্রতি যখনই বনহুরের দৃষ্টি পড়তো তখনই মনে হতো হীমাগারের কঠিন মুহূর্তগুলোর কথা।

আজও বনহুর পাথরটার দিকে তাকিয়ে ভাবছিলো ঐ ক্ষুদ্র পাথরটার জীবনেও রয়েছে বিরাট ইতিহাস যা তারা জানে না। ওর পূর্ব কাহিনী না জানি কত বিস্ময়কর। কারণ ঐ পাথরটি আজ ক্ষুদ্র একটি পাথরে পরিণত হয়েছে। একদিন সে হয়তো বিরাট পর্বত সম ছিলো......তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে বনহুর খেয়াল নেই। বনহুর, ভাল করে তাকালো সে তার শিয়রে রাখী পাথরটার দিকে। পাথরটা কথা বলছে, বললো পাথরটা–বনহুর তুমি আমাকে নিয়ে ভাবছো তাই বড় সাধ হলো, আমার কথাগুলো তোমাকে বলতে। শুনবে আমার কথা?

বনহুর সোজা হয়ে বসলো, সে ভীষণ অবাক হয়ে গেছে পাথর কথা বলে এটা সে জানতো না। তবে কি পাথরের প্রাণ আছে?

পাথরটা হেসে বললো–জানি তুমি খুব অবাক হয়ে গেছো। কিন্তু তুমি জেনে রাখো বনহুর এ পৃথিবীতে শুধু মানুষই কথা বলতে পারে না। সবাই কথা বলে, সকলের প্রাণ আছে।

বললো বনহুর–তাই নাকি?

হাঁ বনহুর। জানো না দেয়ালের কান আছে।

বললো বনহুর–জানি।

বললো পাথরের নুড়িটা–তাহলে অমন অবাক হচ্ছো কেন?

বললো বনহুর–পাথর কথা বলতে পারে এটা আমি জানতাম না, তা ছাড়া তুমি আমার নামও জানো দেখছি?

খিল খিল করে হেসে উঠলো পাথরের নুড়িটা।

দু চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে বনহুর। অদ্ভুত সে হাসি ভারি মিষ্টি সে কণ্ঠস্বর।

হাসি থামিয়ে বললো পাথরের নুড়িটা এমন হা করে কি ভাবছো?

ভাবছি এত সুন্দর করে তুমি হাসতে পার।

তুমি আরও সুন্দর করে হাসো।

আমার হাসি তুমি কখন দেখলে?

তোমার প্যান্টের পকেটে বসেই আমি তোমার হাসি দেখেছি। তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে।

তাই নাকি? বললো বনহুর।

পাথরটা বললো–হাঁ।

তুমি নাম জানলে কেমন করে আমার

তোমার সঙ্গী যখন তোমাকে নাম ধরে ডাকছিলো তখন আমিও তোমার সঙ্গে ছিলাম তাই নাম জানতে আমার কোনো বেগ পেতে হয় নি।

বললো বনহুর–তুমি যে বলেছিলে তোমার জীবন কাহিনী আমাকে শোনাবে?

হাঁ শুনবে?

শুনবো

এত ধৈর্য আছে তোমার?

আমি এখন সম্পূর্ণ শান্ত সব শুনবো।

তবে শোন বনহুর–আজ আমাকে যেমন ছোট্টটি দেখছো আসলে কিন্তু আমি এমন ছোট্টটি ছিলাম না।

তাই নাকি? বললো বনহুর।

হাঁ, আমি অনেক বড়–মস্ত বড় পর্বত ছিলাম।

পর্বত?

হাঁ পর্বত।

তারপর?

যুগ যুগ ধরে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম আমার জন্মকাহিনী আমি জানি না। কত কোটি বছর পূর্বে আমার জন্ম তাও জানি না। দাঁড়িয়ে ছিলাম যেমন করে আমার মত আরও পর্বতগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তেমনি আমিও দাঁড়িয়ে ছিলাম।

বনহুর কোনো কথা না বলে শুনে যাচ্ছিলো নিশ্চুপ হয়ে।

বলে চলেছে পাথরটা।

একদল জলদস্যু আমার দেহের মধ্যে বসবাস শুরু করে দিলো। ওরা দিনের বেলায় আমার দেহের মধ্যে লুকিয়ে থাকতো আর যখন সন্ধ্যার অন্ধকার পৃথিবীর বুকে নেমে আসতো তখন ওরা এক ঝাঁক অশ্ব নিয়ে বেরিয়ে পড়তো। আমার পাশ দিয়ে একটা পথ ছিলো ঐ পথে কোনো পথিক যদি এসে পড়তো তাকে ওরা হত্যা করতো এবং তার ধন সম্পদ সব লুটে নিতো। শুধু পথিক নয় তারা আমার দেহের উপরে বিভিন্ন গর্তে গা ঢাকা দিয়ে চোখে দূরবীণ লাগিয়ে দেখতোআমার পাশ কেটে যে সাগরটি চলে গিয়েছিলো সেই সাগরে কোনো জাহাজ তাদের দৃষ্টিগোচর হলেই তারা ছিপনৌকা নিয়ে অথবা তাদের দ্রুতগামী ক্ষুদে জাহাজ নিয়ে তারা সেই যাত্রীবাহী জাহাজের ওপর হামলা চালাতো। লুট আর হত্যালীলা সাঙ্গ করে যখন তারা ফিরে আসতো তখন আমার বুকটা হু হু করে কেঁদে উঠতো। অফুরন্ত, অগণিত ধন রত্ন এনে জমা করতে আমার দেহের কোনো গুহায়। আমি নীরবে সহ্য করতাম, দেখতাম। ভাষা আমার ছিলোনা তাই নিশ্চুপ শুধু দেখেই যেতাম। এমনি করে কেটে গেলো অনেক বছর। ওরা একদিন একটি তরুণীকে কোনো জাহাজ লুট করার সময় পাকড়াও করে আনলো। সেই তরুণীর কান্না আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। সত্যি অমন করে আমি কাঁদতে কাউকে দেখিনি। তারপর

শুরু হলো জলদস্যুদের মধ্যে তরুণীটিকে নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি। যে মারামারির শেষ পরিণতি হলো তাদের মধ্যে হত্যালীলা।

তারপর? প্রশ্ন করলো বনহুর।

পাথরের নুড়িটা বলে চলেছে–প্রায় সবাই নিহত হলো, বেঁচে রইলো মাত্র দুজন– একজন জলদস্যু সর্দার, অপরজন অনুচর। সর্দার তরুণীটাকে যথেচ্ছাচারণ করতে চাইলে কিন্তু তরুণী। তাতে রাজি ছিলো না, সে একদিন জলদস্যু সর্দারের অজ্ঞাতে আমার বুক থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলো। সর্দার তরুণীটিকে না পেয়ে উম্মাদ হয়ে উঠলো এবং ক্ষিপ্ত হয়ে একটিমাত্র যে অনুচর ছিল তাকেও হত্যা করলো। তারপর দিন যায়, রাত আসে। এমনি করে কেটে গেলো কয়েকটা বছর। সর্দার ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লো। তার দেহে দেখা দিলো কুষ্ঠ রোগ। হাত পা। সব কুঁকড়ে গেলো, চলনশক্তি রহিত হলো তার। এমন কি খাবার সংগ্রহ করবার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেললো। লুণ্ঠিত ধনসম্পদের মধ্যে হেঁটে বেড়াতো আর বিড়বিড় করে বলতে নানা কিছু। হয়তো বা বিগত জীবনের কথা স্মরণ করে দুঃখ অনুভব করতো, অনুশোচনা করতো। তখন তার চলনশক্তি রহিত। হামাগুড়ি দিয়ে চলতো তখন, তারপর একদিন সে হামাগুড়ি দেবার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেললো। নিশ্চুপ জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেলো তার সেই ভীষণকার বলিষ্ঠ দেহটা। একটা গোঙানির শব্দ শোনা যেতো মাঝে মাঝে, তারপর একদিন তাও থেমে গেলো, একেবারে অসাড় হয়ে পড়লো তার দেহটা। পাথরে মুড়িটা নিশ্চুপ হয়ে কিছু ভাবলো, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো—-একদিন তার দেহটা আমার বুকের মধ্যে পচে গলে মিশে গেলে, শুধু পড়ে রইলো পাপার্জিত ধনসম্পদের স্তূপ। যা ভোগ করার কেউ রইলো না।

বনহুর বললো–তোমার কাহিনী কি শেষ?

হেসে বললো পাথরের নুড়িটা–এই তো সবে শুরু।

বলো কি?

হাঁ

এত কথা বলতে পারো তুমি? বললো বনহুর।

পাথরের নুড়িটা বললো–আমাকে ছোট্টটি দেখছো কিন্তু আমার বয়স অনেক অনেক–কোটি কোটি বছর। কবে কখন কেমন করে আমার জন্ম হয়েছিলো তা আমি জানি না।

দু চোখে বিস্ময় নিয়ে বনহুর তাকিয়ে আছে পাথরের নুড়িটার দিকে। এত সুন্দর কথা বলতে পারে পাথরের নুড়ি তা কোনো মতে ভাবতে পারেনি সে।

বনহুরকে বিস্ময়ভরা নয়নে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললো পাথরের নুড়িটা–অমন করে আমার দিকে তাকিয়ে আছো কেন বলোতো?

শুনছি তোমার কথাগুলো বড় সুন্দর আর অদ্ভুত তোমার কণ্ঠস্বর।

হাসলো পাথরের নুড়িটা, তারপর হাসি থামিয়ে বললো–তোমার চেয়ে সুন্দর নয় আমার কণ্ঠস্বর। তোমার মত আমি সুন্দর নই বনহুর। তোমার মত মহৎও নই আমি। যাক ও কথা, বলতে যখন শুরু করেছি তখন বলে যাই তুমি শোন।

বেশ বলো।

জানি তোমার ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে তবুও আমি সব কথা তোমাকে বলবো।

বলো আমি শুনবো। বললো বনহুর।

পাথরের নুড়িটা বলে চললো–জলদস্যু ও তার দলবল মৃত্যুবরণ করলো আর তার সম্পদগুলো আমার দেহের উদরের এক গহ্বরে পড়ে রইলো। মাঝে মাঝে আমার গহ্বরের মধ্যে জমে ওঠা অগ্নিচাপ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো, তখন আমার দেহে কম্পন জাগতো এবং কিছু কিছু অংশ ধ্বসে পড়তো। এমনি একদিন আমার গহ্বরে কিছু অংশ ধ্বসে পড়লো এবং সেই ধনসম্পদগুলো চাপা পড়ে গেলো আমার মধ্যে।

সত্যি!

হ্যাঁ, সব সত্যি।

তারপর?

এমনি বহু দস্যু আর অসভ্য জংলীরা আমার চারপাশে এসে বসবাস করতো। তাদের মধ্যে মারামারি ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকতো। কত যে রক্তপাত আমি দেখেছি তার কোনো হিসেব নেই। কত যে মানুষের দেহ আমার দেহের সঙ্গে মিশে একদিন ধূলিকণায় পরিণত হয়েছে তারও কোনো সংখ্যা নেই। কত বর্ষা, কত খরা, কত ঝড়ঝঞ্জ আমার দেহের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে তা তোমার আংগুলে গুণে হিসেব করতে পারবে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো পাথরের নুড়িটা, তারপর বললো–হঠাৎ একদিন বিস্ফোরণ ঘটলো, প্রচন্ড সে বিস্ফোরণ, আমার গহবরের অগ্নিমিশ্রিত গলিত লাভা বেরিয়ে এলো আমার মুখ থেকে। তারপর সেই প্রচন্ড বিস্ফোরণ, আমার দেহটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ছিটকে পড়লো চারপাশে।

আমার দেহের মধ্য হতে বেরিয়ে এলো অগ্নি আর গলিত লাভা, তার সঙ্গে প্রচন্ড জলস্রোত। সে জলস্রোতের ধারা এতো প্রখর ছিলো যা আমার দেহের টুকরাগুলোকে গড়িয়ে নিয়ে চললো। আমি গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে নামতে লাগলাম।

বড় আশ্চর্য তোমার জীবন কাহিনী! বললো বনহুর।

নুড়িটা আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো, তারপর বলতে শুরু করলো সে–দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আমি খরস্রোতে ভেসে গড়িয়ে গড়িয়ে চললাম আমার অসংখ্য সাথী আর সঙ্গীদের সঙ্গে। দেহটা আমার বড় এবড়ো থেবড়ো ছিলো, গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে গিয়ে আমার আকার ক্রমান্বয়ে গোলাকার হতে লাগলো। বেশ বড়োসড়ো ছিলাম কিন্তু যতই গড়িয়ে চলছি ততই আমার আকার ছোট হয়ে চললো আর হতে লাগলো মসৃণ। একদিন আমার চলার শেষ হলো–দেখলাম, আমি একটা ঝর্ণাধারার মধ্যে এসে পড়েছি। সুন্দর সচ্ছ জলধারা আমার বুকের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। আমি কিন্তু আটকে পড়লাম আমার মত আরও অন্যান্য সঙ্গীর সঙ্গে। সুন্দর সচ্ছ জলধারা কুল কুল করে বয়ে যাচ্ছে আমার বুকের ওপর দিয়ে। সোনালী সূর্যের আলো, আর রূপালী জোছনা আমার বুকে বয়ে চলা জলরাশিকে স্বর্গীয় করে তুললো। খুব ভাল লাগছিলো আমার। নতুন পরিবেশে, নতুন জীবন নিয়ে আকাশের তারা গুণতাম রাতের বেলায়।

সত্যি তোমার কাহিনী বড় সুন্দর।

তা বটে কিন্তু,

বলো থামলে কেন?

এত আনন্দের মধ্যেও আমার বুকটা মাঝে মাঝে হু হু করে কাঁদতো।

কারণ?

ভাবতাম কোথায় ছিলাম আর কোথায় এলাম। হ্যাঁ, শোন তারপর।

বলো?

আমার ঝর্ণাধারায় মাঝে মাঝে অনেক জীবজন্তু পানি পান করতে আসতো। কখনও বা হিংস্র জানোয়ার, কখনও বা নিরীহ জীব। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম, বড় ভাল লাগতো আমার। মাঝে মধ্যে ওরা আমার সঙ্গে কথা বলতো। সুখ–দুঃখের অনেক কাহিনী। হিংস্র জীবজন্তুলোকে আমার মোটেই পছন্দ হতো না, সত্যি বলতে কি আমি অন্যায়কে মোটেই সহ্য করতে পারতাম না। দেখেছি একদিন এক হরিণশিশু নিঃশব্দে পানি পান করছিলো ঠিক ঐ সময় একটি হিংস্র বাঘ পানি পান করতে এলো, বেচারী হরিণ শিশু পানি পান করা শেষ না করেই পশুপতিকে অভিবাদন জানালো এবং পথ থেকে সরে দাঁড়ালো।

বেশ তো মজার কথা?

হ্যাঁ, কিন্তু রেহাই পেলো না সেই নিরীহ হরিণশিশুটি। পানি পান করবার পূর্বেই তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো কাছে, তারপর যখন সে এলো তখন বললো– সালামতো করলি বেটা কিন্তু তার সঙ্গে বখশী কই? জানি না আমি তোদর নেতা? তা ছাড়া তোর চেয়ে সবদিক দিয়ে শক্তিশালী……

হাত জুড়ে বলেছিলো হরিণশিশুটি–আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, আমাকে এবারের মত মাফ করে দিন।

কিন্তু বাঘটি মাফ করার পরিবর্তে ওর ঘাড় মটকে ভক্ষণ করে ফেললো। ভক্ষণ করার পূর্বে বললো বাঘটা তোর বখশী লাগবে না, তুই নিজেই তোর বখশীস, বুঝলি? হরিণশিশু কিছু উপলব্ধি করবার পূর্বেই তাকে হত্যা করা হলো এবং অতি সহজে তার দেহটা ভক্ষণ করে ফেললো বাঘটা। এমনি আরও কত দেখলাম দুর্বলের ওপরে সবলের নির্মম অত্যাচার।

বললো বনহুর–হাঁ ঠিক আমিও অনেক দেখেছি কিন্তু তুমি যেমন নীরবে দেখেই গেছো আমি ঠিক ততখানি নিশ্চুপ থাকতে পারিনি। দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার বন্ধ করবার জন্য আমি আঘাত হেনেছি........

বনহুরের কথা শেষ হয় না, হেসে উঠলো পাথরের নুড়ি, বলে সে–পেরেছে তা বন্ধ করতে?

একটু বিব্রত হলো বনহুর, চট করে জবাব দেয়া হয়ে উঠলো না।

পূর্বের মতই হাসলো পাথরের নুড়িটা, সে হাসি বিদ্রূপ আর ব্যাঙ্গপূর্ণ, বললো–জানি তুমি এর জবাব দিতে পারবে না, কারণ পৃথিবী সৃষ্টি হবার পর হতেই এ নিয়ম চলে আসছে। সবল আর দুর্বল......দুর্বলের প্রতি সবলের নির্মম অত্যাচার অনাচার চিরদিন চলে আসছে, তেমনি চলবেই।

বললো বনহুর–কেন এর কি কোনো প্রতিকার নেই।

তুমি দেখছি আমাকেও ভাবিয়ে তুললে।

কেন আমার প্রশ্নের কি কোনো জবাব নেই।

পাথরের নুড়িটা একেবারে যেন বোবা বনে গেলো। তার তীক্ষ্ণ চোখ দুটোকে অসহায় মনে হলো। চোখ দুটো নামিয়ে নিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলো সে।

বনহুর এমন সুযোগ নষ্ট করলো না, পাথরের নুড়িটা এতক্ষণ তাকে বেশ কাহিল করে তুলছিলো। এবার বনহুর সুবিধা করে নিয়ে বললো–তুমিও দেখছি আমার কথার জবাব দিতে পারছো না?

এর জবাব কেউ কোনোদিন দিতে পারবে না।

কারণ?

চিরকাল দুটো শ্রেণী থাকবে–দুর্বল এবং সবল।

না, তা চলবে না। কঠিন কণ্ঠে বললো বনহুর।

আবার পাথরের নুড়িটা হো হো করে হেসে উঠলো, তারপর হাসি থামিয়ে বললো–পারবে তুমি এর সমাধান করতে?

না পারলেও চেষ্টা করবো এবং যারা আগামী দিনে জন্ম নিবে তারাও সগ্রাম করবে দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য......

কিন্তু তাতে রক্তক্ষয় ছাড়া কোনো লাভ হবে না–হয়নি কোনোদিন।

এবার তুমি আমাকে হাসালে পর্বতরাজ।

আমাকে উপহাস করছো? আজ হয়তো আমার দেহটা ক্ষুদ্র আকার ধারণ করেছে কিন্তু একদিন আমি পর্বতরাজই ছিলাম।

বনহুর অট্টহাসি হেসে উঠলো, তারপর হাসি থামিয়ে বললো–একদিন ছিলে তুমি পর্বতরাজ, সেদিন তোমাকে স্পর্শ করার ক্ষমতা কারও ছিলো না, আর আজ তোমাকে দুআংগুলে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া যায়। তেমনি সবল মানুষগুলো যখন নেতৃত্বের আসনে বসে রাজা মহারাজা বনে যান তখন তারা দুর্বলের প্রতি যত অন্যায় অনাচার অত্যাচারই করুন না কেন কেউ তাকে কিছুই বলতে পারে না বা কিছু করতে সাহসী হয়না আর যখন তাদের অবস্থা তোমার মত হয়, মানে আসনচ্যুত হন তখন তারা ক্ষুদ্র নগণ্য কীটের চেয়েও অধম হয়ে পড়েন। তখন না পান সম্মান না পান কোনো কৃতজ্ঞতা, কারণ তারা জনসমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে নরাধম বনে গিয়েছিলেন। তাছাড়া জনগণ এখন আর পূর্বের মত অজ্ঞ নেই। তারা সজ্ঞান হয়েছে, বুঝতে শিখেছে দুর্বলরা সবলের পায়ের তলায় পিষে মরতে রাজি নয়। কাজেই কালের পরিবর্তন আসবেই আসবে। দুর্বল বলে আর তারা সবলের হাতে নাচের পুতুল বনে থাকবে না।

তোমার কথাগুলো ভারী সুন্দর লাগলো। কালের পরিবর্তন আসবে। তখন কেউ পারবে না তাদের রুখতে। যাক ও সব কথা, এবার কি কথা বলছিলাম শোন–আমি ঝর্ণার বুকে বসে বসে প্রহর গুণতে লাগলাম, দেখলাম কতকিছু। বর্ষামুখর দিনগুলো আমার মনে নতুন আনন্দ বয়ে আনতে, তখন আমি আমার ঝর্ণাবন্ধুর সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে গান করতাম। বনরাণী অভিনন্দন জানাতে তার পল্লবিত শাখা দুলিয়ে দুলিয়ে এমনি এক বর্ষামুখর দিনে এক তরুণ তরুণী এলো। আমার বন্ধু ঝর্ণার ধারে বসে হাসি আর গানে ভরিয়ে তুললো চারদিক। বড় ভাল

লাগলো আমার ওদের দুজনকে। ওরা প্রাণ খুলে হাসে, কথা বলে, ঝর্ণার পানিতে নেমে সাঁতার কাটে, আবার ঝরণার পানি আজলা ভরে তুলে নিয়ে ছড়িয়ে দেয় এ ওর গায়ে। ওদের হাসিগানে ভরে উঠলো বনভূমি।

তারপর?

ওরা একদিন না এলে আমার ভারী খারাপ লাগতো। ওদের পথ চেয়ে বসে থাকতাম। আবার যখন আসতো, হাসি গানে মুখর করে তুলতে ঝর্ণার ধার, তখন আমিও প্রাণভরে হাসতাম। এমনি করে একদিন সত্যি ভালবেসে ফেললাম ওদের দুজনকে, ভাবলাম একবার যদি ওরা আমাকে স্পর্শ করতো তাহলে আমি ধন্য হয়ে যেতাম। দিন যায় রাত আসে, ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। কল–কাকলিতে মুখরিত হয়ে ওঠে বনাঞ্চল। আমি পথ চেয়ে থাকি ওদের জন্য। ওরা এলে মনে শান্তি পাই, বুক ভরে ওঠে খুশিতে। কিন্তু সে আনন্দ আমার সইল না। একদিন ওরা বসে আছে, গল্প করছে নানা কথা নিয়ে, হঠাৎ অশ্বপদ শব্দ শোনা গেলো। চমকে উঠলো ওরা দুজন। আমিও চমকালাম, কারণ হঠাৎ এ অঞ্চলে এমন করে অশ্ব খুরের শব্দ এই প্রথম। দেখলাম দুজন অশ্বারোহী এসে ওদের পাশে নেমে দাঁড়ালো। তরুণী আর তরুণটির চোখে–মুখে ভয়ার্ত ভাব ফুটে উঠেছে। তরুণী এবং তরুণ এ ওর মুখের দিকে অসহায় চোখে তাকালো। অশ্বারোহী দুজন এসে তরুণীটিকে ধরে ফেললো এবং তাদের একজন তরুণটিকে হত্যা করার জন্য সূতীক্ষ্ণধার ছোরা বের করলো। বললো লোকটা তরুণীটিকে লক্ষ্য করে–রাজকন্যাকে চুরি করে এনে বনে পালিয়ে ছিলি, এবার কে তোকে রক্ষা করবে? ছোরাখানা তরুণের বুকে বসিয়ে দিতে গেলো মুহূর্ত বিলম্ব না করে তরুণী ঝাঁপিয়ে পড়লো তরুণের বুকে। ছোরাখানা সমূলে বিদ্ধ হলো তরুণীর পাঁজরে। একটা করুণ তীব্র আর্তনাদ ফুটে উঠলো তারপর স্থির হয়ে গেলো তরুণীর দেহটা। তরুণ দুহাতে জড়িয়ে ধরলো তরুণীর রক্তাক্ত দেহ, তারপর ফিরে তাকালো অশ্বারোহীদের মধ্যে যে ছোরা বিদ্ধ করেছিলো তরুণীর পাজরে তার দিকে। তরুণীটিকেও শুইয়ে দিলো মাটিতে তারপর……ভীষণভাবে আক্রমণ করলো সে অশ্বারোহী দুজনকে। হঠাৎ রাজকন্যা নিহত হওয়ায় হতভম্ব হয়ে পড়েছিলো অশ্বারোহী দুজন কারণ তারা তরুণটিকে হত্যা করতে চেয়েছিলো, তরুণীটিকে নয়। কিন্তু তরুণীটি আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ায় ছোরাখানা তারই বুকে বিদ্ধ হয় এবং তরুণীর মৃত্যু ঘটে। আর এই ঘটনার জন্য তারা উভয়ে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলো। তরুণ প্রচন্ডভাবে আক্রমণ চালালো, কেড়ে নিলো সে অস্ত্রধারীর হাতের অস্ত্রখানা এবং সমূলে বিদ্ধ করলো প্রথম অশ্বারোহীর বুকে, যে

অশ্বারোহী তরুণীটির পাজরে ছোরা বিদ্ধ করেছিলো। প্রথম অশ্বারোহী নিহত হবার পর দ্বিতীয় অশ্বারোহীকে আক্রমণ করলো তরুণ! তার আক্রমণের পূর্বেই দ্বিতীয় অশ্বারোহী দৌড়ে পালাতে যাচ্ছিলো কিন্তু পালানো তার আর হলো না। তরুণটির হাতে সেও নিহত হলো।

তারপর? দুচোখে বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করলো বনহুর।

পাথরের নুড়িটার চোখ দুটো ছলছল করছিলো, সে ভারী গলায় বললো– তরুণটি তারপর পাগল হয়ে গেলো। সে ঐ স্থানে ঝর্ণার ধারে তরুণীর মৃতদেহ আগলে নিয়ে বসে থাকতো। আরও দুটো মৃতদেহ পড়ে রইলো তার অদূরে। একদিন মৃত দেহগুলো পচে গন্ধ ছুটলো। দুর্গন্ধে ভরে উঠলো জায়গাটা। পচা মাংসের গন্ধে জীবজন্তুর আনাগোনা শুরু হলো। তরুণটির নাওয়া খাওয়া ছিলো না, সে সর্বক্ষণ তরুণীর মৃতদেহ আগলে বসে বসে বিড় বিড় করে কিছু বলতো। জীবজন্তু এলে তাকে ছোরা নিয়ে তাড়া করতো। দাড়িগোঁফ আর চুল তাকে বিভৎস করে তুললো। সুন্দর চেহারা বিনষ্ট হয়ে গেলো। তারপর দিন দিন জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়লো, একদিন সকালে দেখলাম তার প্রাণহীন দেহটা পড়ে আছে তরুণীর কংকালটার পাশে।

অদ্ভুত তোমার কাহিনী।

হাঁ, আমার জীবন কাহিনী বড় বিস্ময়কর।

তারপর?

একদিন তরুণের দেহটা শিয়াল অন্যান্য জীবজন্তু টেনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভক্ষণ করলো। তার মৃতদেহটা আগলে রাখার মতও কেউ ছিলো না। আমার বুকটা হু হু করে কাঁদতো, আমি শুধু নীরবে দেখেই চললাম কত দিন, কত রাত কত সপ্তাহ কত মাস তারপর বছর যুগের পর যুগ ধূলায় মিশে গেলো তরুণ তরুণীর কংকালগুলো। আমি তেমনি রইলাম, আমার বুকের ওপর দিয়ে যে ঝর্ণাধারা বয়ে চলেছিলো তা একদিন ক্ষীণ হয়ে এলো। তারপর একদিন ঝর্ণা শুকিয়ে একটি শুকনো প্রান্তরে পরিণত হলো, সে সচ্ছ সাবলীল ঝর্ণা ধারাটা আর রইলো না। কিন্তু আমি আমার সঙ্গীদের সঙ্গে তেমনি পড়ে রইলাম। মাঝে মাঝে বন্য জীবজন্তু আমার দেহের ওপর দিয়ে আনাগোনা করতো। রাতে জোছনার আলো দিয়ে প্রখর সূর্যের তাপ আমাকে পরিহাস করতো। আমি তেমনি রইলাম।

তোমার কথা শেষ হয়ে গেলো?

না, শেষ হয়নি বনহুর।

আরও কথা আছে তোমার?

কেন শুনতে তোমার কষ্ট হচ্ছে?

বনহুর বললো–ভারি ভাল লাগছে। সত্যি কত কোটি কোটি বছর পূর্বে তোমার জন্ম তাই কত অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী জমা হয়ে আছে তোমার বুকে।

হাঁ, আজ সব বলবো তোমাকে, তুমি যদি ব্যস্ত না হও কিংবা বিরক্ত না হও। তুমি ভাবছে একটা পাথরের নুড়ি সে আবার কি কাহিনী শোনাবে, তার আবার বলবার কি আছে। সব বাজে, সময় নষ্ট ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু শোন বনহুর, তোমরা মানুষ, কদিনের জন্যই বা তোমরা এ পৃথিবীতে আসো। সামান্য সময় তোমাদের অবস্থান পৃথিবীতে। কটি দিন বইতো নয়, তার মধ্যে তোমাদের সব কাজ সমাধা হয়ে যায়। যখন তোমরা জন্মগ্রহণ করো তখন তোমাদের সঙ্গে তুলনা চলে একটি পুস্পের, পুষ্প যেমন নিষ্কলঙ্ক তেমনি পবিত্রতায় ভরা নবজাত শিশু……তারপর যখন ধীরে ধীরে বড় হও শিশু হতে কিশোর, তরুণ থেকে যুবক তারপর প্রৌঢ় তারপর আসে বার্ধক্য। হাসি কান্না শোক তাপ, হিংসা বিদ্বেষ কলুষিত করে তোলে তোমাদের জীবন। লোভ লালসা দানা বেঁধে ওঠে তোমাদের মনে। তোমরা তখন দ্বিধা করো না কোনো পাপ কাজে।

তুমি যা বলছে সব সত্য। বললো বনহুর।

মানুষ যেমন মিথ্যার দাস আমরা তা নই। এ দুনিয়ায় মানুষের মত সৎ মহৎ কেউ নয়, আবার তেমনি মানুষের মত ঘৃণ্য হীন জঘন্যতম কেউ নেই। মানুষ সব পারে, যা পৃথিবীর অন্য কোনো জীবের পক্ষে সম্ভব নয়।

এত সুন্দর সত্য কথা তুমি বলতে পারো?

হাঁ, আমার আসল কথা ছেড়ে অনেক দূর চলে এসেছি। শোন বনহুর

বলো?

কলস্রোতা ঝর্ণাধারা একদিন শুকনো কঠিন প্রস্তরভূমিতে পরিণত হলো। অবশ্য কয়েক হাজার বছর পরের কথা। কিছু লোক ঐ স্থানে আসা যাওয়া শুরু করলো, তারা কিছু আলোচনা করলো। আবার চলে গেলো, আবার এলো, কাগজ কলম নিয়ে লিখলো কি সব, তারপর আবার চলে গেলো। একদিন দেখলাম অনেক শাবল কুড়াল নিয়ে লোকজন এলো। যে সব বনজঙ্গল কোটি কোটি বছর ধরে সেখানে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলো তাদের মূলে আঘাত করলো ওরা। ধরাশায়ী হলো বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষরাজি। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ফাঁকা হয়ে গেলো বনভূমি, সেখানে তাঁবু পড়লো। শ্রমিকরা সারাদিন পরিশ্রম করে। আর রাত্রিবেলায় ঐ তাবুতে বিশ্রাম করে। তাবুর চারপাশে ওরা আগুন জ্বালিয়ে হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করে। তারপর শুরু হয় পাথর সরানোর পালা। কোদাল দিয়ে পাথর তুলে দূরে সরানোর কাজ চলে, তারপর তৈরি হয় পথ। যানবাহন আসে সেই পথে, গাড়ি বোঝাই হয়ে পাথরগুলো চলে যায় দূরে কোথাও। তারপর সেখানে গড়ে ওঠে দালানকোঠা, ইমারৎ। বিদেশী সাদা মানুষ এসে ভীড় জমায়। তারাই শুধু ভীড় জমায় না, তাদের সঙ্গে আসে অনেক রকম যন্ত্রপাতি আর অনেক রকম মেশিন। অনেক লোক এখানে কাজ করে, তাদের ওপর খবরদারি করে সাদা চামড়াওয়ালা মানুষগুলো। মাঝে মাঝে নির্মমভাবে প্রহার করে তারা শ্রমিকদের। বেচারা শ্রমিকগণ হাড়ভাঙা খাটুনি করেও ওদের খুশি করতে পারতো না। কোনো কোনো সময় ওরা বিদ্রোহী হয়ে উঠতো, তখন তাদের উপর আরও বেশি নির্যাতন চলতো। চাবুকের আঘাতে ওদের চামড়া কেটে রক্ত ঝরতো তবু নিস্তার বা রেহাই ছিলো না। তীব্র রৌদ্রতাপে পুড়ে যেত ওদের চামড়া, তবু কাজ করতে হতো, নইলে চাবুকের ঘা পড়তে পিঠে। আমি শুধু দেখতাম আর ভাবতাম এর নামই কি মানবতা? কিন্তু কোনো জবাব খুঁজে পেতাম না। একদিন আমাকেও ওরা একটি যানে উঠিয়ে নিলো আমার অন্যান্য সঙ্গীর সঙ্গে।

তাই নাকি? বললো বনহুর।

পাথরের নুড়িটা বললো, আমাকে গাড়িতে অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে উঠিয়ে নিয়ে চললো গাড়িখানা। ভাবলাম যাক এত দিনে নতুন পথের যাত্রী হলাম। কিন্তু আমার অদৃষ্ট মন্দ বলতে হবে, আমাকে এনে একটা পাথর স্তূপে ফেললো আমার অন্যান্য সঙ্গীর সঙ্গে। আবার দীর্ঘ সময় আমাকে সেই পাথর স্তূপে পড়ে থাকতে হলো। তারপর একদিন গভীর রাতে কয়েকটি লোক এলো আমাদের পটার পাশে। ওরা কিছু এনেছিলো একটি পুঁটলিতে করে। পুঁটলি খুলতেই চমকে

উঠলাম। এক গাদা স্বর্ণালংকার। ভাগাভাগি শুরু হলো, তারপর বাক–বিতন্ডা, হঠাৎ বাকবিতন্ডা পরিণত হলো হাতাহাতি মারামারিতে। ছোরা–পিস্তল নিয়ে চললো লড়াই। মরলো কয়েকজন, আর কয়েকজন সোনাদানা নিয়ে উধাও। এখানেও দেখলাম ক্ষমতার লড়াই। সবল ছিলো যারা তারা দুর্বলকে পরাজিত করে জয়ী হলো। তারপর আর একদিন আমার পাশ দিয়ে কয়েকজন লোক যাচ্ছিলো, হয়তো বা পথিক হবে। ঠিক আমার পেছনে লুকিয়েছিলো কতকজন অস্ত্রধারী যুবক। পথিকগণ যখন কাছাকাছি এসে পড়লো তখন তারা হৈ হৈ করে বেরিয়ে এলো। লাঠি আর অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করলো নিরীহ পথিকদের, তারপর লুটে নিলো যা ছিলো ওদের কাছে সবকিছু। দিন দিন এসব দেখে হাঁপিয়ে উঠতে লাগলাম। আমাদের কেন এখানে আনা হলে আর কেনই বা পথের ধারে ফেলে রাখা হলো ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

সত্যি বড় আশ্চর্য তোমার গল্প! বললো বনহুর!

পাথরের নুড়িটা বললো–তুমি আশ্চর্য হচ্ছে, আমি কিন্তু একটুও আশ্চর্য হইনি।

কারণ তোমার জন্ম কোটি কোটি বছর পূর্বে। এ পৃথিবীর অনেক কিছু তুমি দেখেছছ, অনেক জেনেছো।

তা অবশ্য ঠিক কারণ তোমাদের জন্মের বহুকাল পূর্বে আমার জন্ম। অনেক কিছু দেখার এবং জানার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সব হয়তো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তোমাকে বলতে পারবো না, তবে যতটুকু মনে পড়ছে তাই বলছি। এরপর এলো কয়েকজন লোক, মাথায় ক্যাপ পরা, মুখে দামী চুরুট। চোখে কালো কাঁচের চশমা। তারা যা বললো তাতে বুঝলাম আবার আমাদের যাত্রা শুরু হবে। আবার এলো যানবাহন, আমাদের তুলে নেয়া হলো। বেশ কয়েকদিন ধরে আমাদের বাহনগুলো এলোপাতাড়ি এবড়ো থেবড়ো পথে চললো, তারপর আমারে নিয়ে এক বিরাট নদীর তীরে নামিয়ে রাখলো, শুনলাম নদীর ওপরে আমাদের নিয়ে ব্রীজ তৈরি হবে। শুরু হলো মাপজোক, এলো মস্ত বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার, এলো মেশিন কলকজ্বা। আমার তো চক্ষুস্থির এমন ধরনের মেশিন এমন কলকজা আমি দেখিনি কিনা, তাই বড় অবাক হলাম। কোথায় সেই কুল কুল করে বয়ে চলা কলস্রোতা জলধারা আর কোথায় এই বিরাট বিরাট লৌহপ আর মেশিনও যন্ত্রপাতি। গোটা আকাশ ছেয়ে ধূম্ররাশি, সচ্ছ বাতাসকে করে তুলেছে বিষাক্ত! কাজ চলছে, নতুন ব্রীজ হবে হীমাদ্রি নদীর বুকের ওপর দিয়ে।

চমৎকার তোমার কথাগুলো। বললো বনহুর।

পাথরের নুড়িটা হাসলো বনহুরের কথা শুনে, তারপর বলতে শুরু করলো–ব্রীজ তৈরি হচ্ছে। অহরহ কাজ চলছে, ইলেকট্রিক আলো জ্বালিয়ে গোটা নদীতীর আলোকিত করা হয়েছে। একদিন সন্ধ্যায় কি ব্যাপার নিয়ে সাদা চামড়াওয়ালা লোকদের সঙ্গে শ্রমিকদের ভীষণ তর্কবিতর্ক শুরু হলো। হঠাৎ এক সাহেব আমাকে তুলে নিলো হাতে এবং একটি শ্রমিকের মাথায় প্রচন্ডভাবে আঘাত করলো।

তারপর?

আমি কিছু বুঝবার পূর্বেই শ্রমিকটা মাটিতে পড়ে গেলো এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করলো। আশেপাশে আরও অনেকে ছিলো তারা সব লক্ষ্য করছিলো। ছুটে এলো বড় সাহেব ঘটনাস্থলে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি সবকিছু। একজন শ্রমিক আমাকে হাতে তুলে নিয়ে দেখালো–মালিক, এই পাথরের নুড়িটা তুলে নিয়ে ওকে জোরে আঘাত করেছে। যার জন্য সে মৃত্যুবরণ করলো। সঙ্গে সঙ্গে ফোর্স পৌঁছানোর পূর্বেই সেই সাদা লোকটা যে শ্রমিকটিকে নিহত করেছিলো সে দ্রুত আমাকে হাতে তুলে নিয়ে পকেটে রাখলো, তারপর ক্ষিপ্রগতিতে একটি জীপ গাড়িতে চেপে বসলো। অন্যান্য কেউ লক্ষ্য করার পূর্বেই গাড়ি নিয়ে সে উধাও।

বিস্ময়কর ঘটনা বটে।

হাঁ বিস্ময়কর বটেই, গাড়ি নিয়ে এলোপাতাড়ি ছুটলো লোকটা। এসব পথ তেমন মসৃণ বা সমতল ছিলো না, তাই জীপ গাড়িটা হোঁচট খেয়ে খেয়ে ছুটতে লাগলো। যেখানে ব্রীজ তৈরি হচ্ছিলো তার অনতিদূরেই ছিলো বিমান বন্দর। লোকটা জীপ রেখে বিমান বন্দরে প্রবেশ করলো এবং কৌশলে অপরের একটি বিমান টিকেট সংগ্রহ করে নিলো। তারপর বিমানে আরোহণ করলো।

তুমি তখন কোথায়? প্রশ্ন করলো বনহুর।

পাথরের নুড়িটা স্বাভাবিকভাবে বললো–আমি তখনও তার প্যান্টের পকেটে।

তোমাকে সে কেন সঙ্গে নিলো?

এই সামান্য ব্যাপারটা বুঝতে পারলে না, তুমি না দস্যু সম্রাট। তোমার বুদ্ধির কাছে অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও নাকি বোকা বনে যায়।

তুমি কিন্তু আমার কথাটা বেশি বাড়িয়ে বলছ। আমি একটা সামান্য মানুষ বইতো নয়।

তবু তুমি অসাধারণ……

যাক ওসব তোমার কাহিনী বলল? বললো বনহুর।

পাথরের নুড়িটা বলতে আরম্ভ করলো–বিমানখানা খুনীকে বুকে নিয়ে আকাশে উড়ে চললো। আমাকে পকেটে তুলে নিয়েছিলো সে। এ কারণে যেন প্রমাণ না থাকে কি দিয়ে সে শ্রমিকটাকে আঘাত করে হত্যা করেছিলো। বিমানখানা যখন কোনো এক পর্বতমালার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলো তখন খুনী কৌশলে আমাকে বিমান থেকে নিক্ষেপ করে নিচে। তারপর থেকে আমি সেই পর্বতমালার নির্জন স্থানে পড়ে থাকি। কেটে যায় বছরের পর বছর। যুগের পর যুগ। আমার পাশ কেটে চলে যায় কত জীবজন্তু। কত সর্পরাজ, কত কীটপতঙ্গ। আমি নীরবে প্রহর গুণি। আমার জীবনের ঘটনাগুলো জমাট বেঁধে উঠতে থাকে আমার মনের গহনে। তারপর হঠাৎ একদিন দেখলাম আমাকে কেউ কেউ হাতে তুলে নিলো। ভাবলাম যাক বহুদিন পর আবার আমার জীবনে এলো মনুষ্যদেহের কোমল স্পর্শ। তারপর তুমি আমাকে গ্রহণ করলে, আমি ধন্য হলাম তোমার স্পর্শ পেয়ে….একটু থেমে বললো পাথরের নুড়িটা–অনেক রাত হয়েছে, এবার ঘুমিয়ে পড়ো।

হাঁ, ঘুমাবো কিন্তু তুমি–তুমি ঘুমাবে না? বললো বনহুর।

পাথরের নুড়িটা হাই তুলে বললো–হাঁ, আমিও ঘুমাবো।

বনহুর বালিশে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে নুরীর কণ্ঠস্বর–আর কত ঘুমাবে? ওঠো বনহুর।

বনহুর ধড়মড় করে শয্যায় উঠে বসলো, রাত ভোর হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। নূরী দাঁড়িয়ে আছে শয্যার পাশে।

বনহুর এবার নূরীর মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে দৃষ্টি রাখলো তার শিয়রে রক্ষিত টেবিলে পাথরের নুড়িটার উপরে। তেমনি পড়ে রয়েছে নুড়িটা, গোলাকার সুন্দর পাথরখন্ড।

নূরী বললো–পাথরটার দিকে অমন করে তাকিয়ে কি দেখছো বনহুর?

একটু হেসে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বললো বনহুর–কিছুনা।

নূরী বললো–এত বেলা অবধি তুমি কোনোদিন ঘুমাও না। আজ তুমি এমন গভীরভাবে ঘুমাচ্ছিলে আমি তো বেশ ভয় পেয়েছিলাম। ঘুমের মধ্যে কি সব বিড় বিড় করে বলছিলে?

হয়তো স্বপ্ন দেখছিলাম। বনহুর বুঝতে পারলো এতক্ষণ সে স্বপ্নের মধ্যে পাথরের নুড়িটার সঙ্গে কথোপকথন করছিলো।

নূরী বললো–যাও, মুখহাত ধুয়ে এসো! হয়তো রহমান ভাই এক্ষুণি এসে পড়বে।

বনহুর শয্যা ত্যাগ করলো। কিন্তু তার কানের কাছে পাথরের নুড়িটার কণ্ঠস্বর তখনও ভাসছে।

*

এমনি করে আর কতদিন ওকে আগলে রাখবি মা? কথাগুলো বললো নাসরিন।

ফুল্লরা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো–যতদিন আমার দেহে প্রাণ থাকবে। ওকে–ছাড়া আমি বাঁচবো না যে মা।

কিন্তু জাভেদ তো এখনও তেমনি উদাসীন। ওর কোনো সংজ্ঞা নেই। কে ওর মা, কে ওর বাবা তাও বুঝতে পারে না। প্রেম প্রীতি ভালবাসা এর কোনোটাই ওকে স্পর্শ করে না।

জানি মা, আমি সব জানি। তবু যে আমি….না না, ওকে ছাড়া আমি বাঁচবোনা মা। কথাগুলো বলে ফুল্লরা বেরিয়ে গেলো।

নাসরিন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কন্যার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে। প্রেম এত কঠিন, এত নির্মম……

রহমান সেই মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত হলো। নাসরিনের কথাগুলো তার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করেছিলো, তাই সে স্ত্রী নাসরিনকে লক্ষ্য করে বললো–প্রেম কঠিন, নির্মম এ কথা কে তোমাকে বললো

বলতে হয় না, অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করা যায়।

না, তোমার কথা আমি মানি না নাসরিন, কারণ প্রেমপ্রীতি ভালবাসাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে! যদি প্রেম–প্রীতি ভালবাসা না থাকতো তাহলে এ পৃথিবী মানুষের কাছে প্রাণহীন মনে হতো। প্রেম–প্রীতি ভালবাসা আছে বলেই না মানুষ হাসে কাঁদে গান গায়, কাজ করে, সবকিছু তো প্রেম–প্রীতি আর ভালবাসার নিদর্শন।

নাসরিন স্বামীর মুখে এমন কথা কোনোদিন শোননি। রহমানকে নাসরিন স্বামী রূপে পেয়েছে বটে কিন্তু তার মধ্যে যে একটা সুন্দর মন আছে তা সে জানতো না। সব সময় নাসরিন স্বামীকে দেখেছে এক কঠিন কর্মময় পুরুষ হিসেবে। কাজ ছাড়া কিছুই যেন করবার নেই তার। আজ রহমানকে নাসরিন নতুন রূপে দেখছে।

রহমান বলেই চলে–এই যে পৃথিবীর মানুষগুলো দেখো সবাই প্রেমিক, কেউ ভালবাসে সন্তানকে, কেউ ভালবাসে পিতা–মাতাকে, স্ত্রী ভালবাসে স্বামীকে, স্বামী ভালবাসে স্ত্রীকে, আবার যারা সত্যিকারের সাধক তারা ভালবাসে আল্লাহকে। প্রেম না থাকলে ভালবাসা আসে না, ভালবাসা না থাকলে প্রেম হয় না। কাজেই ভালবাসা আর প্রেম একই জিনিস যা অত্যন্ত পবিত্র।

তুমি–তুমি–এত সুন্দর করে বলতে পারো তা তো জানতাম না।

অবাক হচ্ছো নাসরিন?

হাঁ, কারণ তোমাকে আমি এক কঠিন কর্মময় পুরুষ হিসেবে দেখেছি। দেখেছি সর্দারের একনিষ্ঠ সঙ্গী হিসেবে। তার নির্দেশ পালন ছাড়া আর কিছু তোমার করবার আছে বলে জানতাম না।

নাসরিন, তোমার কথা সত্যি। সর্দারকে ভালবাসি আর সে কারণেই আমি তার আদেশ পালন করি।

তুমি তাহলে সর্দারের প্রেমে আত্মহারা?

হাঁ। তুমি যা বলছে তাও সত্যি। ঐ তো বললাম কেউ আল্লাহর প্রেমে মশগুল, কেউ কাজের প্রেমে আত্মহারা। কেউ গানের প্রেমে মত্ত। প্রেম–প্রীতি ভালবাসা পাপ নয়, পবিত্রময়।

কোনো তরুণ–তরুণীর প্রেমে দিশেহারা তাকেও তুমি পবিত্র বলবে?

হাঁ, যতক্ষণ তা কোনো অসৎ পথে এগুবে না বা সীমা লঙ্ঘন করবে না ততক্ষণ তা পাপ নয়। যে কোনো তরুণ–তরুণীকে ভালবাসতে পারে যদি তাতে অপবিত্রতার ছোঁয়াচ না স্পর্শ করে। ভালবাসা সার্থক তখন যখন তা পবিত্রতার মধ্যে দিয়ে মিলন হয়।

কিন্তু মিলনের সম্ভাবনা যদি না থাকে?

হাসলো রহমান, তারপর বললো–সর্ব জাতির জন্য রয়েছে এমন একটি পথ যেখানে তারা পবিত্র মিলনে আবদ্ধ হতে পারে। গীর্জা, মসজিদ, মন্দির যা বলল......তাছাড়াও রয়েছে একজন যাকে সাক্ষী রেখে আমাদের বিবাহ বন্ধন পবিত্রময় করে তোলা যায়, তবে সবকিছু সীমা ছাড়িয়ে নয়।

ফুল্লরা ভালবাসে জাভেদকে কিন্তু......

আমি জানি, জাভেদ সম্বিহারা, তাই সে ওকে পরিহার করে চলে।

সত্যি মেয়েটার জন্য আমার বড় চিন্তা হচ্ছে।

আমি সব বুঝি নাসরিন কিন্তু করবার কিছু নেই। জাভেদ এখন একরোখা হয়ে পড়েছে, সে যখন যা খুশি করে। তাকে কিছুতেই বাগে আনা সম্ভব হবে না।

ফুল্লরা সর্বক্ষণ ওকে আগলে রেখেছে। ওর সবকিছু সেই করে দেয় শুধু নাওয়া আর ঘুমানোটা ছাড়া। মেয়েটার মুখের দিকে তাকালে বড় দুঃখ হয়।

সব সহ্য করতে হবে নাসরিন। জাভেদকে ফুল্লরা যেমন ভালবাসে তেমনি ভালবাসতে হুমায়রা। থামলো রহমান, তার চোখে মুখে একটা করুণ ব্যথা ভরা ভাব ফুটে উঠলো।

নাসরিন বললো–সত্যি আমিও দুঃখিত মেয়েটা গেলো কোথায়।

হাঁ, বহু খুঁজেছি তবু তাকে পাওয়া গেলো না। না জানি সে জীবিত আছে না মরে গেছে কে জানে।

নাসরিন আর রহমান কথাবার্তা চলছিলো এমন সময় একজন অনুচর এসে দাঁড়ালো সেখানে, সে বললো–রহমান ভাই, সর্দার ডাকছে।

আচ্ছা, চলো। কথাটা বলে রহমান অনুচরটির সঙ্গে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর পায়চারী করছিলো।

রহমান দরবারকক্ষে প্রবেশ করে কুর্ণিশ জানালো এবং বললো–সর্দার আমাকে ডেকেছেন?

হাঁ। বড় দুঃসংবাদ।

বলুন সর্দার?

রহমান, তুমি তো জানো ঝাম জঙ্গলে রাণী দুর্গেশ্বরী দেবীর একটা আশ্রয় ছিলো

জানি সর্দার।

সেই আশ্রমে প্রতিদিন শত শত দীন–হীন গরিব লোকেরা কিছু সাহায্য পেত।

হাঁ, তাও জানি।

কাল রাতে ঝামরাণী তাকে বন্দী করে নিয়ে গেছে এবং কঠিন শাস্তি দিচ্ছে তাকে কারাগারে বন্দী রেখে। এ সংবাদ ঝাম থেকে আমাদের অনুচর বোরহান আলী জানিয়েছে।

রহমান প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলে ধরলো সর্দারের মুখের দিকে।

বনহুর বললো–এখনও তারা রাণী দুর্গেশ্বরীকে কারাগারে একটি থামের সঙ্গে বেঁধে কশাঘাত করে চলেছে।

তার অপরাধ?

অপরাধ দেশের জনগণকে রাণী দুর্গেশ্বরী সাহায্য দান করে, তাদের নাকি নিজ দাস বানিয়ে নিচ্ছে এবং এ কারণেই রাণী ঝম সুন্দরী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন।

আদেশ করুন সর্দার, আমরা কি করব?

কান্দাই সাগর হয়ে আমি ঝম সাগরে গিয়ে পৌঁছতে চাই। ডুবু জাহাজটিকে প্রস্তুত করে নাও মালামাল নিয়ে। কমপক্ষে সপ্তাহ দুইয়ের খাবার এবং পানি নেবে। অস্ত্র গোলাগুলি যা প্রয়োজন সাথে নেবে। অনুচরদের মধ্যে যাদের তুমি ভাল মনে করবে তাদের নেবে।

আচ্ছা সর্দার। আপনার নির্দেশ মতো কাজ করবো সর্দার।

বলো রহমান?

ঝাম শহরে যাবার জন্য আমাদের ডুবুজাহাজ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে গেলে হয় না? ডুবুজাহাজের ক্যাপ্টেন স্মিথ অসুস্থ।

বনহুর বললো–কোনো অসুবিধা হবে না রহমান। আমি নিজে ক্যাপ্টেন স্মিথের দায়িত্ব গ্রহণ করবো।

আচ্ছা সর্দার, কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে গেলো রহমান।

ডুবুজাহাজ উল্কা সব সময় প্রস্তুত থাকতো কান্দাই সাগরবক্ষে গভীর পানির তলায়। যে মুহূর্তে বনহুরের আস্তানা থেকে সংকেত পেতো তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে নিতো। অন্যান্য দিনের মত রহমান ওয়্যারলেসে উল্কায় সংবাদ পৌঁছালো। সর্দারের নির্দেশমত উল্কায় সবকিছু গুছিয়ে নেবার জন্যও অনুচর কায়েসকে বলে দিলো।

উল্কা আকারে বৃহৎ এবং জলদস্যু হামবার্ডের ডুবুজাহাজের মতই কিছুটা, তবে তার সাজ সরঞ্জাম কিছুটা আলাদা।

বনহুর তার কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরসহ রওয়ানা দিলো ঝাম সাগর অভিমুখে। উল্কার গতি অত্যন্ত দ্রুত, গভীর জলের মধ্য দিয়ে তীরবেগে ছুটে

চললো উল্কা। বনহুর নিজে ক্যাপ্টেন স্মিথের দায়িত্ব পালন করে চললো।

বিরাট জাহাজখানা গভীর জলরাশির তলা দিয়ে বেগে অগ্রসর হচ্ছে। জাহাজের সুরক্ষিত ক্যাবিনে ক্যাপ্টেন স্মিথ অবস্থান করতেন এবং সেই ক্যাবিনের মধ্যে চারপাশে ছিলো নানা ধরনের মেশিন। সারিবদ্ধ কল–কজা। সুইচ, হ্যান্ডেল এবং ওয়্যারলেস মেশিন। একেবারে সম্মুখে ছিলো দিকদর্শন যন্ত্র।

বনহুর ক্যাপ্টেন স্মিথের আসনে উপবেশন করে সম্মুখস্থ দিক দর্শন মেশিনটার দিকে তাকিয়ে সুইচ টিপছিলো।

উল্কার চালকগণ সাংকেতিক নির্দেশ মত উল্কা চালনা করে চলেছিলো।

একটি মেশিন ছিলো যার মধ্যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো সব কিছু। বনহুর দেখলো তাদের জাহাজ এমন এক জলপথ অতিক্রম করতে যাচ্ছে যে পথের দুপাশে আছে বৃহৎ আকার ডুবুপাহাড়। কোনোক্রমে যদি ঐ ডুবু পাহাড়ের সঙ্গে তাদের জাহাজের ধাক্কা লাগে তাহলে সমূলে জাহাজখানা ধ্বংস হয়ে যাবে। অতি সাবধানে তাই অগ্রসর হচ্ছিলো বনহুরের ডুবুজাহাজখানা।

সুদক্ষ ক্যাপ্টেনের মতই বনহুর উল্কা চালনা করে চলেছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উল্কা ডুবু পাহাড় অতিক্রম করে বেরিয়ে এলো, তারপর নীলনদ, নীল নদ অতিক্রম করার পর পাবে তারা ঝাম সাগর। নীলনদ ভয়ংকর আর প্রচণ্ড, তার তরঙ্গায়িত জলরাশির তল দিয়ে উল্কা তীরবেগে এগিয়ে চলেছে।

সামনে তেমন কোনো বাধা নেই। সাংকেতিক মেশিন সেই সংবাদ পরিবেশন করেছে। বনহুর ক্যাপ্টেন স্মিথের কর্তব্য পালন করে চলেছে।

একদিন তারা ঝাম সাগরে পৌঁছে গেলো।

বনহুর উল্কার গতি মন্থর করার জন্য ডুবুজাহাজের চালকগণকে নির্দেশ দিলো।

গভীর জলরাশির তলদেশে বনহুরের ডুবুজাহাজখানার গতি ক্রমান্বয়ে মন্থর হয়ে এলো। বনহুর জলরাশির উপরিভাগ লক্ষ্য করে চললো তার সম্মুখস্থ টেলিভিশন পর্দায়। যে স্থানে বনহুর তার উল্কাটিকে রাখলো ঝামবন্দর সে স্থান হতে কয়েক মাইল দূরে।

বনহুর রাত্রির প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করতে লাগলো। রহমান ছিলো তার পাশে, তাকে বলে দিলো বনহুর–আজ রাতেই অভিযান চালাবো।

*

ঝাম নগরী নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে।

আকাশে অসংখ্য তারার মালা মিটমিট করে জ্বলছে। পথঘাট নির্জন, কোনো কোনো বাড়ি থেকে ভেসে আসছে ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নার আওয়াজ। মাতৃদুগ্ধ না পেয়ে শিশু কেঁদেই চলেছে, তার সঙ্গে শোনা যাচ্ছে পিতার নিদ্রাভাঙা গম্ভীর কণ্ঠস্বর–ছেলেটাকে কাঁদাচ্ছো কেন।

নারীকণ্ঠ আমি কি আর সখ করে কাদাচ্ছি বলো। হয়তো বা সন্তানকে আদর করে কোলের মধ্যে টেনে নিতে নিতে কথাটা বললেন স্ত্রী।

এমনি নানা শব্দ ভেসে আসছে, রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রতিধ্বনি হচ্ছে শব্দগুলো।

বনহুর জমকালো ড্রেসে সজ্জিত।

তার কোমরের বেল্টে সূতীক্ষ ধার ছোরা, একপাশে রিভলভার গোঁজা রয়েছে। মাথার পাগড়ি দিয়ে মুখমন্ডলের অর্ধাংশ ঢাকা।

রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার রুদ্ধ।

বনহুর অদূরে এসে দাঁড়ালো।

পাশে রহমান, তার শরীরেও জমকালো ড্রেস এবং সূতীক্ষ ছোরা ও রিভলভার রয়েছে।

বললো বনহুর–রহমান, আজ আমি রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করতে চাই না। শুধু জানতে চাই ঝামের রাজকারাগার কোনদিকে।

সর্দার আমি জানি।

তুমি জানো রহমান?

হাঁ সর্দার। ঝামরাণী যখন জংলী সর্দারের কবলে পড়ে গভীর জঙ্গলে আবদ্ধ ছিলো তখন আপনি তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এসেছিলেন আমিও ছিলাম আপনার সঙ্গে। ঝামরাণীকে উদ্ধার করতে গিয়ে আমি ঝামরাজ্যের অনেক গোপন রহস্য এবং গোপন পথ আবিষ্কার করেছিলাম।

রহমান, সে কথা বলোনি কেন এতদিন?

কোনো প্রয়োজন মনে করিনি তাই।

তবে তুমি বলতে পারবে কোন্ পথে আমি ঝামের রাজ–কারাগারে প্রবেশ করতে পারবো?

হাঁ, বলতে পারবো সর্দার।

রাতের অন্ধকারে বনহুরের মুখ স্পষ্ট নজরে না পড়লেও রহমান বুঝতে পারলে, সে খুশি হয়েছে তার কথা শ্রবণ করে।

বনহুর আর রহমান এমন এক স্থানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো যেখান থেকে রাজপ্রাসাদ স্পষ্ট নজরে পড়ছিলো কিন্তু তাদেরকে কেউ দেখতে পাচ্ছিলো না।

রহমান বললো–সর্দার, যে সকল লোকজন রাণী দুর্গেশ্বরীর নিকট হতে সাহায্য পেতে তারা নিতান্ত গরিব এবং বিকলাঙ্গ মানুষ। তাদের কোনো কর্মক্ষমতা ছিলো না। অত্যন্ত অসহায় বলেই তাদের প্রতি রাণী দুর্গেশ্বরীর এত দয়া। কথাটা ঝাম রাণীর কানে দেওয়া হয়েছে অন্যভাবে, ঝামবাসীদের মধ্যে প্রচুর সাহায্য দান করে সমস্ত লোকজনকে নিজের আয়ত্তে আনছে রাণী দুর্গেশ্বরী এরা নাকি একদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসবে। ঝামরাণী এই ভয়ে অনুচরদের নির্দেশ দিয়েছিলো তারা রাণী দুর্গেশ্বরীকে বন্দী করে নিয়ে আসে এবং তাকে যেন কঠিন শাস্তি দেয়া হয়।

রহমানের মুখে কথাগুলো শুনে বনহুর বললো–তুমি দেখছি সব সংবাদ সংগ্রহ করেছ।

সর্দার, আমি পৌঁছেই শ্রমিকের বেশে সব জেনে নিয়েছি এক গরিব শ্রমিকের কাছে।

তোমাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না।

সবই তো আপনার শিক্ষা সর্দার।

তুমি প্রস্তুত থাকবে রহমান, আমি প্রথমে ঝম রাণীর সঙ্গে মোকাবেলা করবো। একদিন আমি তাকে জংলীসর্দারের কবল থেকে উদ্ধার করেছিলাম আর আজ আমি যাবো তার কাছে তার কর্মের কৈফিয়ত নিতে।

আচ্ছা সর্দার। রহমান কথাটা বলে সরে দাঁড়ালো।

বনহুর চলে এলো রাজপ্রাসাদে প্রবেশপথের সিংহদ্বারের কাছাকাছি। একজন প্রহরী সিংহদ্বারের পাশে বসে বসে ঝিমাচ্ছিলো। বনহুর তার পাশে এসে দাঁড়ালো।

প্রহরী রীতিমত তন্দ্রাচ্ছন্ন।

বনহুর দ্রুতহস্তে ওর মুখখানা রুমালে বেঁধে হাত দুটো রশি দিয়ে বেঁধে ফেললো। তারপর ওর কোমরের থলে হতে চাবি নিয়ে খুলে ফেললো সিংহদ্বার খুলবার হ্যান্ডেলখানা। তারপর বনহুর হ্যান্ডেল ঘোরাতে লাগলো। ফাঁক হলো সিংহদ্বার, বনহুর সেই ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করলো রাজপ্রাসাদে।

ঝামরাণীর কক্ষ চিনে নিতে বনহুরের বিলম্ব হলো না, কারণ বনহুর আগে থেকেই জানতো কোন্ কক্ষে ঝামরাণী শয়ন করে। কারণ ঝাম রাজ্যে বনহুরের এই প্রথম আগমন নয়।

বনহুর জমকালো ড্রেসে সজ্জিত এবং মাথার পাগড়ির কিছু অংশ দিয়ে মুখমন্ডলের অর্ধেক ঢাকা। প্রাসাদের রেলিং বেয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো বনহুর।

সম্মুখে ঝামরাণীর শয়নকক্ষের দরজা।

পেছন অংশে আর একটি রেলিংঘেরা বেলকুনি।

বনহুর সেই পথে কক্ষে প্রবেশ করলো।

কক্ষে প্রবেশ করে তাকালো বনহুর চারপাশে।

একপাশে মস্তবড় খাট। খাটের ওপরে শায়িত ঝামরাণী। যদিও হালকা মশারী টাঙানো ছিলো তবুও কক্ষের নীলাভ আলোতে স্বপ্নপুরীর রাজকন্যা বলে মনে হচ্ছিলো ঝামরাণীকে।

এলায়িত সুদীর্ঘ কেশরাশি ছড়িয়ে আছে বালিশের চারধারে। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে তাকে, বনহুর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তাকালে দেয়ালে টাঙানো ঝামরাণীর ফটোর দিকে। ফটোখানা শিকারী ড্রেসে সজ্জিত পোশাকে ভোলা।

বনহুর এবার খুলে নিলো নিজ কোমরের বেল্ট থেকে সূতীক্ষ্ণধার ছোরাখানা। তারপর ঝামরাণীর শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

মশারীটা টেনে একপাশে সরিয়ে ফেললো বনহুর। তারপর ছোরাখানা তার বুকের কাছে বাগিয়ে ধরে গম্ভীর গলায় বললো–ঝামরাণী, কত ঘুমাও......

ঝামরাণীর নিদ্রাভঙ্গ হলো।

চোখ মেলে তাকাতেই ভীষণ চমকে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করতে যাচ্ছিলো ঝামরাণী কিন্তু বনহুরের হাতের সূতীক্ষ্ণধার ছোরাখানায় নজর পড়ায় কণ্ঠ তার থেমে গেলো, দুচোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকালো ঝামরাণী। যদিও বনহুরকে ঝামরাণী ভালভাবেই চিনতো কারণ জংলী সর্দারের কবল থেকে বনহুর যখন ঝামরাণীকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিলো তখন একই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করতে হয়েছিলো তাকে। আজ ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলো ঝামরাণী, ঘুম ভেঙে যাওয়ায় আচমকা বনহুরকে সে ঐ মুহূর্তে স্মরণ করতে না পারলেও একটু লক্ষ্য করতেই চিনে নিলো, বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো–তুমি, দস্যু বনহুর......

হাঁ, চিনতে পেরেছো তাহলে। শোন ঝামরাণী, একদিন তোমাকে রক্ষা করেছিলাম কঠিন এক অবস্থা থেকে। আর আজ এসেছি তোমাকে হত্যা করতে যদি তুমি আমার কথা না রাখো...

বনহুর!

ঝামরাণী, তোমাকে আমি মনে মনে শ্রদ্ধা করতাম, কারণ তুমি চিরকুমারী থেকে পিতার রাজ্য পরিচালনা করে যাচ্ছো দক্ষ রাণীর মর্যাদা নিয়ে।

তুমি তো সব জানো।

আরও জানি তুমি আমার প্রজাদের প্রতি অত্যন্ত সদয়।

এ কথা সত্য আমি ভালবাসি আমার রাজ্য, ভালবাসি রাজ্যের প্রজাদের।

এ কারণেই আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি অন্তর দিয়ে......কিন্তু তোমার মন এত নীচ জঘন্য জানতাম না।

মানে? ঝামরাণীর নিদ্রাঘোর সম্পূর্ণ দূরীভূত। সে শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে চাদর দিয়ে শরীর আবৃত করে নিয়েছে।

চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে কাঁধের চারপাশে। চোখেমুখে দীপ্ত ভাব, ভয়ার্ত ভাব মুছে গেছে তার মুখমন্ডল হতে। চাদরখানা দিয়ে দেহটাকে জড়িয়ে রেখে কথা বলছিলো সে বনহুরের সঙ্গে। বনহুরের মুখে যে মুহূর্তে সে শুনলো নীচ জঘন্য তার মন তখন তার গোটা মুখে কে যেন কালিমা লেপন করলো, ভ্রূ ভ্রুকুঞ্চিত করে বললো ঝামরাণী–কি বললে বনহুর?

যা সত্য তাই বলছি। যদি তোমার মন প্রশস্ত হতো, তাহলে তুমি রাণী দুর্গেশ্বরীকে বন্দী করে তার ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাতে না।

বনহুর, তুমি জানোনা সে কি ভীষণ অন্যায় করে যাচ্ছিলো।

জানি তোমার রাজ্যের অসহায় মানুষগুলোর প্রতি সদয় ব্যবহার করতো।

সদয় ব্যবহার। বলো কি বনহুর। আমার রাজ্যের মানুষগুলোকে সে হাতের মুঠায় ভরে নিয়ে এক অভিনব অভিনয় শুরু করেছিলো। মানুষগুলোকে তার কৃতদাস বানিয়ে নিচ্ছিলো অর্থের বিনিময়ে......

মিথ্যা কথা। রাণী দুর্গেশ্বরী তোমার রাজ্যের মানুষগুলো যারা নিতান্ত অসহায় দীন–হীন গরিব তাদের মধ্যে কিছু অর্থ দান করতে কারণ তার প্রচুর ধন-সম্পদ আছে যা ভোগ করার কেউ নেই এবং এ কারণেই রাণী দুর্গেশ্বরী......

ও নাম আমার সামনে বারবার উচ্চারণ করো না। আমি বহুদিন তাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। আমার রাজ্যের মানুষগুলোকে হাত করে নেবার চেষ্টা করো না।

বুঝেছি তোমার মনে দুর্বলতা রাণী দুর্গেশ্বরী কোন দিন না তোমার রাজ্য দখল করে বসে।

সে যেভাবে আমার প্রজাদের মধ্যে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করে নিচ্ছিলো তাতে তোমার কথার শেষ অংশ সত্যে পরিণত করতে সে দ্বিধাবোধ করতো না।

ঝামরাণী, তুমি নারী হয়ে নারী হৃদয় চিনতে ভুল করলে। রাণী দুর্গেশ্বরী কোনোদিন তোমার রাজ্য দখল করতে আসতো না, কারণ তোমার ধনভাণ্ডারে যে ধন-সম্পদ আছে তার চেয়ে কোনো অংশে কম নেই রাণী দুর্গেশ্বরীর।

তারই অহংকারে সে আত্মহারা এবং আমার রাজ্যে আধিপত্য বিস্তারে প্রয়াস পেয়েছে।

তুমি জানো না ঝামরাণী......

সব জানি এবং জানি বলেই আমি তাকে বন্দী করেছি। শুধু বন্দী করেই আমি ক্ষান্ত হইনি, আমি তাকে হত্যা করবো প্রয়োজনবোধে।

তুমি নারী না পিশাচী। নারী হয়ে একটা নারীর প্রতি এত নির্মম হতে পারলে?

সে যদি নারী হয়ে আমার প্রজাদের বিপথগামী করে চলে, আমি তাকে ক্ষমা করতে পারি না।

ঝামরাণী তোমার কাছে সে অপরাধী নয়, এখানে তাই কোনোক্রমে ক্ষমার প্রশ্নই আসে না। তোমার রাজ্যের প্রজা যারা নেহায়েৎ অকর্মণ্য পঙ্গু তাদের মধ্যে সে কিছু দান করে তৃপ্ত হয়......

এবার ঝামরাণী হেসে উঠলো খিল খিল করে, তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বললো–আমার প্রজাদেরকে সে অকর্মণ্য পঙ্গু বানিয়ে দেশকে পঙ্গু করে দেবার চেষ্টা করছে। তারা আমার অবাধ্য হয়ে যাচ্ছে। ঠিকমত কর দান থেকেও তারা বিরত আছে।

শুনেছি তুমি এসব প্রজার প্রতিও অন্যায় অবিচার করছো? তাদের সকলের প্রতি তুমি কড়া নির্দেশ দিয়েছে বিনা করে কেউ রাজ্যে বসবাস করতে পারবে না?

হাঁ, এরূপ নির্দেশ আমি দিয়েছি।

আরও শুনেছি যারা কর দিতে অক্ষম তাদের প্রতি তোমার দন্ড খণ্ডনীয়। তুমি তাদের নির্মম শাস্তি দিয়ে থাকো।

এ কথা আরও স্পষ্ট করে বলতে হবে তোমাকে। রাণীর আদেশ পালনে অসমর্থ হলে শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। আমার আদেশ পালন না করলে আমি তাদের হত্যা করতেও কুণ্ঠীত হবো না।

আমরাণী, এত হৃদয়হীন তুমি।

তোমার চেয়ে নয়। একজন দস্যুর মুখে এমন কথা শোভা পায় না। একটু থেমে বললো পুনরায় ঝামরাণী–আমার রাজ্যের কোনো ব্যাপারে আমি কার কাছে কোন কৈফিয়ত দিতে রাজি নই। রাণী দুর্গেশ্বরী শুধু প্রজাদের সর্বনাশ করছিলো না, সে আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করছিলো।

ষড়যন্ত্র?

হাঁ

কি রকম? ভ্রুকুঞ্চিত করে তাকালো বনহুর ঝামরাণীর মুখের দিকে।

ঝামরাণী শরীরের চাদরটা গায়ে আরও ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে শয্যার একপাশে বসলো, তারপর বললো–এমন সোজা ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছে না? সে প্রচুর অর্থের সাহায্যে আমার প্রজাদের হাত করে নিচ্ছিলো এবং পরে আমার সিংহাসন ও রাজ্য দুটোই সে অধিকার করে নিতে, কিন্তু আমি তা হতে দেবো না।

ও এই কথা। এ কথা তো তোমার মুখে পূর্বে শুনলাম।

হাঁ, আবারও আমি তোমাকে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বললাম, আর আমি কোনো কথা বলতে রাজি নই। তুমি চলে যাও যে পথে এসেছিলে সেই পথে, নইলে……

নইলে প্রহরীকে ডাকবে?

তোমাকে বন্দী করতে আমার মোটেই সময় লাগবে না বনহুর।

তাই নাকি? কিন্তু আমিও যাচ্ছি না যতক্ষণ না তুমি রাণী দুর্গেশ্বরীকে মুক্ত করে না দিয়েছে।

না। কিছুতেই তা সম্ভব নয়।

এ আমার নির্দেশ।

একজন দস্যুর নির্দেশ ঝামরাণী পালন করবে এ কথা তুমি কেমন করে ভাবতে পারলে

ঝামরাণী, তুমি এ কথা ভুলে যেও না। তোমার মনে রাখা দরকার, কার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি কথা বলছে।

একটা দস্যু ডাকুর সাথে কথা বলছি। প্রাসাদে......

দস্যু হলেও সে তোমার রক্ষক এ তুমি ভুলে গেছো এরি মধ্যে?

আজ তুমি সেই অধিকার নিয়ে এসেছে একটা অন্যায় নির্দেশ পালন করতে?

না।

তবে তুমি বার বার ঐ কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছো কেন? কোন্ অধিকারে তুমি আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেছে বনহুর?

তোমার নির্মম আচরণ আমাকে বাধ্য করেছে ঝামরাণী। তুমি এত হৃদয়হীন জানতাম না। নিজ রাজ্যের গরিব অসহায় মানুষগুলো যদি কোথাও হতে কিছু অর্থ সাহায্য পায়, তারা যদি সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করে, রোগে–শোকে যদি সান্ত্বনা পায় তাতে তোমার খুশি হওয়া উচিত। কিন্তু তুমি গরিব প্রজাদের রক্ত শোষণ করে কর আদায় করো। প্রজারা কেমন থাকলে তা তুমি দেখো না।

বলেছি তোমার কোনো কথা আমি শুনতে রাজি নই।

তুমি তোমার প্রজাদের ওপর অত্যাচার করতে পারবে না।

কোন কর তারা আর তোমাকে দেবে না, আমি ওদের নিষেধ করে দেবো। তবে যাদের কর দেবার সাধ্য আছে তারা কর দেবে–যাদের সাধ্য নেই তাদের মাফ

করে দিতে হবে। ঝামরাণী, অসহায় মানুষগুলোর ওপর তোমার কি একটুও মায়া হয় না? ঐশ্বর্যের মোহ তোমাদের কি এতই অন্ধ করে ফেলেছে। যাক ওসব কথা– আমি এ মুহূর্তে কি জন্য এসেছি তাই শোন। রাণী দুর্গেশ্বরীকে মুক্ত করে দাও এবং আমার সঙ্গে এক্ষুণি তোমাকে কারাগারে যেতে হবে।

যদি তোমার কথা আমি না শুনি?

তোমাকে আমি বন্দী করে নিয়ে যাবো আমার ডুবুজাহাজ উল্কায় যা এখন ঝাম সাগরের গভীর তলদেশে অপেক্ষা করছে।

বনহুর!

হাঁ, আমি যেভাবে এখানে প্রবেশ করেছি ঠিক সেইভাবেই আমি তোমাকে তুলে নিয়ে যাবো। তোমার কোনো প্রহরী বা সৈন্যরা তোমাকে ধরে রাখতে পারবে না।

তোমার ডুবুজাহাজ বাম সাগরের তলদেশে অপেক্ষা করছে।

হাঁ ঝামরাণী। আমি কোনো কথা শুনতে বা বলতে রাজি নই। আমি তোমার প্রহরীর বেশে সজ্জিত হয়ে আসছি, তুমি তৈরি হয়ে নাও কারাগারে যাওয়ার জন্য। তুমি নিজে রাণী দুর্গেশ্বরীকে বন্দী করে এনেছ, তুমিই তাকে মুক্তি দিয়ে আসবে। তোমার প্রহরী হিসেবে আমি তোমার সঙ্গে থাকবো। তোমার নির্দেশে কাজ করবো আমি। কারাগার রক্ষকের নিকট হতে চাবি নিয়ে তুমি আমার হাতে দেবে এবং বলবে–যাও রাণী দুর্গেশ্বরীকে তার বাসস্থানে পৌঁছে দিয়ে এসো। বাস তারপর যা করতে হয় আমিই করবো। কোনো কথা আর শুনবো না, মনে রেখো আমাকে বন্দী করতে চেষ্টা করলে তোমার প্রিয় রাজসিংহাসন তুমি হারাবে।

দুচোখ বিস্ফারিত করে বললো ঝামরাণী–কি বললে, তুমি আমার সিংহাসন কেড়ে নেবে।

সিংহাসনের মোহ আমার নেই ঝামরাণী। তখন আমার শপথ হবে তোমাকে সিংহাসনচ্যুত করে অন্যকে রাজ–সিংহাসনে বসানো। হত্যা তোমাকে করবো না, করলে নিদ্রিত অবস্থায় তোমার বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে পারতাম। তা ছাড়া তোমাকে তোমার শয্যা থেকে তুলে নিয়ে যেতেও পারতাম। কিন্তু আমি তা করবো না, তোমার দুর্বলতা আমার কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক হবে। চলো ঝামরাণী……

বনহুর আড়ালে চলে গেলো এবং একটু পরে প্রহরীর ড্রেসে সজ্জিত হয়ে ফিরে এলো।

ঝামরাণী বনহুরের দেহে ঝাম প্রহরীর ড্রেস দেখে অবাক চোখে তাকালো। তার পা হতে মাথা পর্যন্ত ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখছিলো সে।

বনহুর বললো–রাণীজী, আর বিলম্ব করবেন না চলুন।

ঝামরাণী বাধ্য হলো তার নির্দেশ মেনে নিতে, কারণ সে দেখলো শুধু বনহুরই নয়, তার পেছনে কয়েকজন রাজপ্রহরী নতমস্তকে দাঁড়িয়ে আছে। তারা ঝামরাণীর দেহরক্ষী দল।

ঝামরাণী তাদের লক্ষ্য করে কিছু বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু বনহুর বললো রাণীজী, ওদের আমিই সংবাদ দিয়েছি।

ঝামরাণী আর কোনো কথা বললো না, বনহুরকে অনুসরণ করলো।

ঝামরাণীর দেহরক্ষীগণ তাদের পেছনে পেছনে এগিয়ে চললো। প্রশস্ত বেলকুনি ধরে এগিয়ে চললো ঝামরাণী। ঠিক তার পেছনে রয়েছে বনহুর। মৃদুকণ্ঠে বললো বনহুর–কোনো রকম চালাকি করতে যেওনা ঝামরাণী, তাহলে মৃত্যুবরণ করবে।

এত নিম্নকণ্ঠে বললো যা শুনতে পেলো শুধু ঝামরাণী, অন্য কেউ নয়।

বনহুর আর ঝামরাণী দেহরক্ষীগণসহ গভীর রাতে কারাগার কক্ষের সামনে এসে দাঁড়ালো।

দেহরক্ষীদের মনে নানা প্রশ্ন–এত রাতে রাণীজী হঠাৎ কারাগারে এলেন কেন? কি তার উদ্দেশ্য ভেবে পায় না তারা। কিছু প্রশ্ন করবে তারও সাহস তাদের ছিলো না, কারণ তারা ঝামরাণী দেহরক্ষী মাত্র।

ঝাঁমরাণী জানে দস্যু বনহুরের অসাধ্য কিছু নেই। তাকে হত্যা করা মোটেই কঠিন কাজ নয় তার কাছে, তা ছাড়া তাকে তুলে নিয়ে যেতেও তার কিছুমাত্র দ্বিধা থাকবে না তখন। এ কারণেই ঝামরাণী বাধ্য হলো বনহুরের আদেশমত কাজ করতে।

ঝামরাণী কারাগার রক্ষীর নিকটে এসে দাঁড়াতেই সে সসম্মানে মাথা নত করে কুর্ণিশ জানালো।

ঝামরাণী হাত বাড়ালো তার দিকে।

কারাগার রক্ষী চাবির গোছা রাণীর হাতে দিলো। দুচোখে তার বিস্ময়, গভীর রাতে কারাগারে রাণীজীর উপস্থিতি তারা কিছুতেই আশা করেনি। ব্যাপার কি তবে? কিন্তু জিজ্ঞাসা তার মনেই রয়ে গেলো।

ঝামরাণী চাবির গোছা নিয়ে বনহুরের হাতে দিয়ে বললো–যাও প্রহরী, তুমি রাণী দুর্গেশ্বরীকে তার বাসস্থানে পৌঁছে দিয়ে এসো।

কারাগারের লৌহকপাট খোলর শব্দে নিদ্রা ভেঙে গেলো রাণী দুর্গেশ্বরীর। দুচোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তাকালো সে লৌহফটকের বাইরে। ঝামরাণী এবং তার সঙ্গে বেশ কিছু প্রহরীদের দেখে অবাক হলো। হাত-পায়ে তার শৃংখল ছিলো। সমস্ত শরীরে বেত্রাঘাতের চিহ্ন। চুলগুলো এলোমেলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। নিদ্রাজড়িত চোখে তাকালো সে। বনহুরকে দুর্গেশ্বরী চিনতে পারে না, তাকে রাণী দুর্গেশ্বরীর দেহরক্ষী মনে করে সে।

রাণী দুর্গেশ্বরী উঠে দাঁড়িয়েছে, তার শরীর বেতসপত্রের মত কাঁপছে। কারণ, আজ কদিন তার ওপরে চলেছে নানা রকম অকথ্য অত্যাচার। মন তার বিষিয়ে উঠেছে, বাচবার ইচ্ছা তার নেই। দেশ ও দশের মঙ্গল কামনাই ছিলো তার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু তাকে তার উদ্দেশ্য পালন করতে দিলো না, ঝামরাণী তাকে ভুল বুঝলো। চেয়েছিলো জীবনে যা কিছু উপার্জন সে করেছিলো তা অসহায় মানুষদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে তার সামান্য দান একটি মানুষের জীবন রক্ষার্থেও যদি সক্ষম হয় তাহলেও সে ধন্য হবে। জীবনে সে বহু উপার্জন করেছে, তা শুধু জমিয়ে রাখার জন্য নয়, দেশ ও দশের স্বার্থে যদি ব্যয় করতে না পারে তাহলে সে ধন-সম্পদের কোনো প্রয়োজন নেই! চেয়েছিলো দুর্গেশ্বরী আর্তের সেবা করতে, চেয়েছিলো তার সঞ্চিত ধন-সম্পদ দিয়ে জনগণের উপকার করতে। অন্য কোনো উদ্দেশ্যই তার ছিলো না। তবু তাকে বন্দী করে আনা হলো এবং কারাগারে কঠিন শাস্তিদানে হত্যা করার প্ল্যান করা হলো সুদক্ষভাবে। হঠাৎ মুক্তির বাণী, একি সে স্বপ্ন দেখছে?

দরজা ততক্ষণে খুলে দেয়া হলো।

বনহুর বললো–রাণী দুর্গেশ্বরী, ঝামরাণী তোমাকে মুক্তি দিচ্ছেন। চলে এসো……

দুর্গেশ্বরী ধীর শান্ত দৃষ্টি তুলে তাকালো ছদ্মবেশী বনহুরের দিকে।

তার পাশে ঝামরাণী।

ঝামরাণীর পরিচ্ছদ এ মুহূর্তে সাধারণ, একটি চাদর তার দেহ বেষ্টন করে আছে।

সশস্ত্র দেহরক্ষীগুলো তার পেছনে অস্ত্র উদ্যত করে দাঁড়িয়ে আছে।

দেহরক্ষীবেশী বনহুর বললো–এসো, রাণীজীর আদেশ তোমাকে তোমার আবাসস্থলে পৌঁছে দিতে হবে।

রাণী দুর্গেশ্বরী ধীর মন্থরগতিতে বেরিয়ে আসে ঝাম কারাগার থেকে।

ঝামরাণীর দেহরক্ষীবেশী বনহুর রাণী দুর্গেশ্বরীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলো রাজপ্রাসাদ থেকে।

রাণী ওদের গন্তব্যপথের দিকে তাকিয়ে রইলো স্তব্ধ হয়ে। ঝামরাণী নিজে এসেছিলো তাদের বিদায় জানাতে রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে।

দেহরক্ষীগণ ভেবে পাচ্ছে না হঠাৎ করে রাণীজীর মতের পরিবর্তনের কারণ কি। তাদের মনে যত প্রশ্নই নাড়া দিক না কেন কারও সাহস হলো না জিজ্ঞাসা করার।

একজন দেহরক্ষী সাহস করে বললো–রাণীজী, রাণী দুর্গেশ্বরীকে এভাবে মুক্তি দেয়া কি উচিত হলো?

ঝামরাণী ফিরে তাকালো এবার সেই নির্ভীক দেহরক্ষীটির দিকে। এমন কারও সাহস নেই, রাণীজীর কাজের কোনো ত্রুটি ধরে বা তার কাজের সমালোচনা করে।

রাণীজী ভ্রুকুঞ্চিত করে বললো–ওকে বন্দী করে আমি ভুল করেছিলাম।

বলেন কি–রাণীজী। আপনি ভুল করেছিলেন?

হা।

কিছুতেই আমরা মেনে নেবো না রাণীজী, কারণ রাণী দুর্গেশ্বরী ঝামজঙ্গলে বাস করে। ঝামবাসীদের সকলকে অর্থ দিয়ে নিজের আয়ত্তে এনে নিচ্ছে এবং একদিন সে ঝাম সিংহাসন দাবি করে বসবে।

না, সেটা আমাদের ভুল ধারণা।

রাণীজী।

ঠিকই বলেছি। কেউ যদি গরিব অসহায় মানুষগুলোর প্রতি সদয় হয়ে কিছু দান করে, সেটা অপরাধ নয়, যদি তার পেছনে কোন দুষ্টদুরভিসন্ধি না থাকে।

রাণী দুর্গেশ্বরীর এই দানের পেছনে কোনো গোপন অভিসন্ধি ছিলো, এবং সেই কারণেই আপনি তাকে বন্দী করেছিলেন কিন্তু……

কেন তাকে মুক্তি দিলাম?

হা রাণীজী, এখন আমাদের মনে সেই প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু আমরা সাহসী হচ্ছি না। আপনাকে কোনো প্রশ্ন করে আপনার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে।

তবে জানতে চেও না কেন তাকে মুক্তি দিলাম।

*

কথাটা বলে প্রাসাদ অভিমুখে পা বাড়ালো ঝামরাণী।

শয্যায় শয়ন করেও তার চোখে আর ঘুম এলো না। বার বার তার মনে ঐ একটি বলিষ্ঠ মুখ ভেসে উঠতে লাগলো। একবার সে তার জীবনে এসেছিলো ধূমকেতুর মত। আম জংলী সর্দার যখন তাকে বন্দী করে রেখেছিলো তখন সে এসেছিলো উদ্ধার করতে। তখন ঝাম সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন তার পিতা। সে তখন ঝম রাজকন্যা। জংলী সর্দারের কবল থেকে ঝাম রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এসেছিলো স্বয়ং দস্যু বনহুর।

বনহুরকে ঝাম রাজকন্যা সেই প্রথম দেখেছিলো। সেদিন তার মনপ্রাণে নতুন এক উন্মেষে ভরে উঠেছিলো, এমন পুরুষ তার জীবনে এই প্রথম সে দেখলো। গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছিলো রাজকন্যা বনহুরকে। তাকে আপন করে পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিলো সে কিন্তু রাজকন্যা বনহুরের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেনি, অদ্ভুত সে পুরুষ। ঝাম রাজকুমারী সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলা যায় তবুও বনহুর তাকে উদ্ধারের পর আর কোন সাক্ষাতলাভের আশায় ঝাম শহরে আসেনি। কিন্তু ঝাম রাজকুমারী তার জন্য প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত প্রতীক্ষা করেছে, হয়তো বা সে আসবে। দিনের পর দিন কেটে গেছে রাজকুমারীর হৃদয় ব্যথায় ভরে উঠেছে, কিন্তু সে আর আসে নি। তারপর বহু রাজকুমার এসেছে ঝাম রাজ্যের একমাত্র অধিশ্বরী রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী হয়ে। ঝাম রাজ কন্যার বিয়ে দেবার জন্য বহু চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। তারপর একদিন নিজে প্রশ্ন করেছিলেন, মা–মণি, তুমি কেন বিয়েতে মত করছো না? জবাব দিয়েছিলো রাজকন্যা, বাবা আমাকে তুমি ক্ষমা করো বিয়ে আমি করবো না। তারপর কোনোদিন ঝামরাজ কন্যাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেননি। যদিও তাঁর মনে দারুণ একটা ব্যথা জমে উঠেছিলো দিনের পর দিন। যে মনোকষ্ট তার মৃত্যুর কারণ হয়েছিলো। অনেক আশা–আকাংখা ছিলো রাজার মনে, একমাত্র কন্যাকে বিয়ে দিয়ে তার হাতে কন্যা এবং রাজ্যভার তুলে দেবেন কিন্তু সে আশা তার সফল হয়নি। দুশ্চিন্তা রোগে–শোকে একদিন পরপারে চলে গেলেন ঝামরাজ। কন্যা কান্নাকাটি করলো শোকে মুহ্যমান হয়ে, অনেকে এলো সান্তনা দিতে কিন্তু যার জন্য প্রতীক্ষা করছিলো সে আর এলো না। একদিন রাজসিংহাসনে উপবেশন করতে হলো তাকে, কারণ তার কোনো সহোদর ছিলো না। রাজ্যভার গ্রহণ করেও মনে তার তৃপ্তি ছিলো না, অহরহ তার মনকে চঞ্চল করে তুলতে ঐ একটি মুখ, তা হলো বনহুরের। তারপর দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন হয়, এমনি করে কেটে যায়। অনেকগুলো দিন–রাত। ক্রমে রাজ্য আর প্রজা তার মনের শূন্য আসন পূর্ণ করে তোলে। রাজকাজে আত্মহারা হয়ে পড়ে রাজকন্যা। হঠাৎ আবার সেই আকাংখিত ব্যক্তির আগমন অযাচিতভাবে। আমরাণীর মনের পর্দায় সেই মানুষটির প্রতিচ্ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছিলো, আজ আবার নতুন করে তার আবির্ভাব। কেন আবার সে এলো? রাণী দুর্গেশ্বরীর স্থানে যদি সে হতো তাহলে আজ ঝামরাণীর জীবনে আসতো নতুন এক অধ্যায়।

শয্যায় শয়ন করে ঝামরাণী যখন ভাবছে দস্যু বনহুরের কথা, তখন রাণী দুর্গেশ্বরী আর বনহুর গোপন পথ ধরে এগিয়ে চলেছে।

দুর্গেশ্বরী বললো–আবার কেন তুমি আমার জীবনে ফিরে এলে বনহুর? আমি তোমাকে ভুলে যেতে চাই। তোমাকে বিস্মৃত হতে চাই..

বনহুর ফিরে তাকালো রাণী দুর্গেশ্বরীর মুখের দিকে।

এমন সময় দুজন অস্ত্রধারী সৈনিক তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র আবছা অন্ধকারে চক চক করে উঠলো।

[পরবর্তী বই মৃত্যুকূপে দস্যু বনহুর]

বুকমার্ক করে রাখুন 1

Category: দস্যু বনহুর সমগ্র

পূর্ববর্তী:

« ৭.১৮ করাল থাবা

পরবর্তী:

৭.২০ মৃত্যুকূপে দস্যু বনহুর »